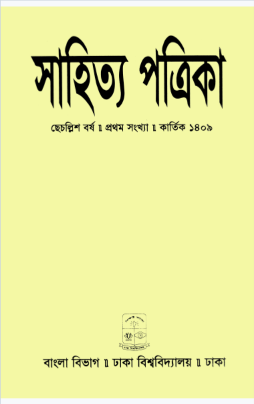

Vol. 46 | No. 1 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'ব্রজবুলি' বৃন্দাবনের ভাষা না, ‘বাঙালা' ভাষা?

Volume	46
Issue	1
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ড. এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	October 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v46i1.342
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i1.342
Pages	৫-৫০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

'ব্রজবুলি' বৃন্দাবনের ভাষা না, 'বাঙালা' ভাষা?*

ড. এস. এম. লুৎফর রহমান

প্রায় সকল শিক্ষিত, সাহিত্য-রসিক পাঠক মাত্রেই জানেন, বাঙালায় মুছলিম আমলে, পনের শতকে বৈষ্ণব কবিরা 'ব্রজবুলি' নামে এমন একটা ভাষায় কাব্য-কবিতা রচনা করেন; যা এখনকার ভাষার সাথে মেলে না। এমন কি, বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠকরাও, সেকালের অন্য যে-সব বই পড়েন; যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতি,সে-সব বৈষ্ণব জীবনী-গ্রন্থের ভাষার সঙ্গেও ঐ ভাষা মেলে না। এই না-মেলার কারণে, বিশ শতকের অমুছলিম পণ্ডিত ও তাঁদের মুরীদ মুছলমান 'আলেম-উলামা' বা বিদ্বানরাও ঐ ভাষাকে 'ব্রজবুলি' নামে আখ্যা দিয়েছেন। যার সহজ অর্থ, ও হ'ল—'ব্রজভূমির বুলি' বা মথুরার 'বৃন্দাবনের ভাষা'। বৃন্দাবনী ভাষা। বৃন্দাবনকে 'ব্রজধাম', 'ব্রজভূমি' ইত্যাদিও বলা হয়। মথুরা বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশে। তখনকার হিন্দুস্তানের এক প্রান্তে; আর বাঙালা অপর প্রান্তে। মথুরা তখন দিল্লীর ছোলতানদের শাসনাধীন। আর 'বাঙালা'র ছোলতানরা স্বাধীন। দিল্লীতে যখন ছোলতান সিকান্দর লোদীর শাসন-আমল; বাঙালায় তখন ছোলতান আলাউদ্দীন হোছেন শাহের শাসন-আমল। তিনি ১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮ ইছায়ী তক রাজ্য শাসন করেন। চৈতন্য দেবের জন্ম হয় ১৪৮৬ -(মতান্তেরে ১৪৮৩)তে। আর তাঁর মৃত্যুকাল ১৫৩৩-এ। চৈতন্য দেব চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এর কিছুকাল পর থেকেই তাঁর প্রচার করা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দুই প্রধান চরিত্র—রাধা-কৃষ্ণকেন্দ্রিক 'লোক-সংগীতে'র প্রচলন হয়। এই গানকেই 'কীর্তন' বলা হয়; আর যে-ভাষায় এ-গান রচিত হয়—তার-ই নাম 'ব্রজভাখা', 'ব্রজভাষা' বা 'ব্রজবুলি'।

বলা দরকার, বোল-বুলি বাঙালা শব্দ, 'ভাখা' মৈথিল শব্দ;, আর 'ভাষা' সংস্কৃত শব্দ।

---

* প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়.।

২

যাহোক, চৈতন্য দেবের জন্ম ১৪৮৬ ইছায়ীতে এবং তাঁর ধর্মপ্রচার ১৫১০-এ। অথচ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান-রচনার ধারা বৈষ্ণবদের হাতে তার আগেই শুরু হয়। এঁদের মধ্যে পঞ্চোপাসক বিদ্যাপতি এবং চণ্ডী-উপাসক চণ্ডীদাস বিশেষ খ্যাতিমান। এই দু'জনের মধ্যে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে—'বিদ্যাপতি ১৩৭০ ইছায়ীতে জ'ন্মে ১৪৭৬-'৭৭-এর আগেই পরলোকবাসী হন।' আর চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে একজন চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য-পরবর্তীকালে 'ষোল শতকে' আর একজন (দ্বিজ) চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে গোপাল হালদারের মতে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি-ই 'ব্রজবুলি ভাষার স্রষ্টা'। তিনি এই ভাষায় 'পহেলা' পদ রচনা করেন। এ-বিষয়ে তাঁর উক্তি নিচেয় কোট করা হ'ল—

"ব্রজবুলি': কৃষ্ণ-লীলা অবলম্বন ক'রে গীতিকবিতা রচনা চ'লেছিল অনেক দিন থেকেই, বিশেষতঃ ভারতের এই প্রাচ্যমণ্ডলে—গৌড়ে-মিথিলায়। মধ্যযুগের বাঙ্লায় সেই গীতিকাব্য কিছু কিছু রচনা হ'য়েছিল জয়দেবের অনুকরণে—সংস্কৃতে, কিছু খাঁটি বাঙ্লায়—চণ্ডীদাসের ধারায়। কিন্তু বেশির ভাগ বৈষ্ণব পদ-ই রচিত হয় একটি মিশ্র ভাষায়, 'ব্রজবুলি'তে। এই ধারার মূল উৎস বলা যায় মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে। ব্রজবুলি যে আসলে ব্রজভূমির ভাষা নয়, মূলতঃ মৈথিল ও বাঙ্লা মিশ্রিত ভাষা, আর তার সঙ্গে, সেখানে এখানে ব্রজবাসী বৈষ্ণব মহাজনদের প্রভাবে মিশ্রিত হ'য়েছে এক-আধটি ব্রজভাষার শব্দ,—এই সত্য প্রথম আবিষ্কার করেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ ও বিশদ আলোচনা ক'রেছেন ড. সুকুমার সেন।"

'ব্রজবুলি'র মতো ভাষার উদ্ভব হ'ল মৈথিল ভাষার কবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-লীলার গীতিসমূহ থেকে। ছফেদ কথায়, এখানে গোপাল হালদার বাবুর মত হ'ল—বিদ্যাপতির রচনা থেকেই 'ব্রজবুলি' ভাষার পয়দা। তবে 'এভাষা উত্তর প্রদেশের ব্রজভূমির ভাষা নয়। মৈথিল ও বাঙালা ভাষার মিশেল ঘটিয়েই এবুলি তৈরী করা হ'য়েছে। তার সাথে দু'একটা ব্রজভূমি বা বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব মোহান্তদের ভাষাও আছে।' এ-বক্তব্যের প্রথম অংশ গ্রহণযোগ্য হ'লেও, শেষাংশ গ্রহণযোগ্য কিনা; তা পরীক্ষা করা দরকার। বিশেষতঃ ব্রজবুলির মত একটা নতুন ভাষা কিভাবে মিথিলার "মৈথিল ভাষার কবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ লীলার গীতসমূহ থেকে" উদ্ভূত হ'ল; তা পরখ করা জরুরী।

তার আগে, প্রথম 'সত্য আবিষ্কারক' ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁর

'ওডিবিএল'-এ 'ব্রজবুলি' সম্পর্কে কি ব'লেছেন, তা দেখা প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন—"56. Maithili has been more fortunate. For a long time after the conquest of Magadha and Bengal, Mithila retained her independence, at least internally, and the first flood of Turki invasion did not pass over her, wrecking the ancient intellectual life. Even after the conquest by the Moslems and virtual suppression of the native kings (c. 1500,cf.R.D. Banerji, `Bangalar Itihas,' II, p. 205), there was nothing like the sweeping destruction of temples and the slaughter of scholars which accompanied the Turki conquest in the 12th and 13th centuries. The Maithili Brahmans were renowned for their Sanskrit learning, and right down to the 16th century Mithila used to be the resort of students from Bengal and other parts of Eastern India (R.D. Banerji, op, cit., pp. 130 ff.). The Brahmans of Mithila did not despise their mother-tongue, and we have an unbroken literary record in Maithili from the beginning of the 14th century, probably even earlier, down to the present day.

The earliest Maithili work which we have is the `Varna-ratnakara' of Jyotirisvara Thakura, who wrote it during the 1st quarter of the 14th century. This work is a sort of lexicon of Maithili and Sanskrit words in the frame-work of several descriptions (e.g., the description of a king's court enumerating all the functionaries and offcials who would be found there). It is preserved in a unique MS. dating from the beginning of the 16th century, now in the library of the Asiatic Society of Bengal.---

Vidyapati Thakura (end of 14th—beginuing of 15th century) is the greatest writer of Maithili. Vidyapati's songs on the love of Radha and Krisna (edited by Nagendra Nath Gupta. VSPd., San 1316) are among the fairest flowers in Indian lyric poetry. These exerted a tremendous influence on the Vaisnava lyric of Bengal. They spread into Bengal, and were admired and imitated by Bengali poets from the 16th century downwards, and

the a ttempts o f t he p eople o f B engal t o p reserve t he M aithiil Language, without studying it properly, led to the development of a curious poetic jargon, a mixed Maithili and Bengali with a few Western Hindi forms, which was widely use in Bengal in composing poems on Radha and Krisna. This mixed dialect came to be called 'ব্রজবুলি'—Braja-buli or specch of Braja, from the fact that the poems composed in it described Krishna's early life and his love with Radha which had for its scene the Vraja district, round about Brindavana near Mathura. This Braja-buli is of course entirely different from the Western Hindi dialect, called `Braj-bhakha, which is current round about Mathura.---The literature in this artificial Braja-buli d ialect i s one of t he m ost beautiful expressions of the poetic spirit of the Bengali people, deservedly popular poets like Govinda-dasa and Jnana-dasa, among a host of others only less famous, having composed exquisite lyrics in it Braja-buli as a poetic dialect is occasionally taken up by the present-day Bangali poets as well, and even Rabindra-nath Tagore has emulated the poetic predecessors in his own language by writing a whole series of poems, the 'Bhanu-sinha Thakurer Padavali', in Braja-buli. Braja-buli poetry is a standing example of the extent to which an entirely artificial dialect can be utilised by a whole people for poetic exercise; and its p osition in B engal can be compared with t hat o f S auraseni Apabhransa and Avahattha outside the Midland in the late MIA and early NIA periods.

In addition to poems in his own vernacular Maithili, Vidyapati has left compositions in a Western Apabhransa speech, a dialect archaic in spirit for his age, which he calls 'Avahattha.' ---There are some short poems, and two long works, the `Kirtti-lata ' and the `Kirtti-pataka,' connected with the achievements of Kirtti-sinha, one of his royal patrons at the beginning of the 15th century.

The oldest specimens of Maithili, as in the `Varna-

ratnakara' and the poems of Vidyapati. present a language which is extremely archaic and simple when compared with the Maithili of the present day. especially noticeable is the simplicity of the verb-system, with its freedom from the ramifications of pronominal infixes and affixes. This is a suffcient indication of the fact that the elaborate conjugational devices of Maithili (and Magahi) are late: since, some traces of these would have been found in these remains if they were in common use in the 11th century. Could these pronominal modifications of the verb have begun in Magadha, with a fresh, peaceful influx of Kol people from the South, manifesting themselves first in the Magahi speech and in Maithili as spoken to the south of the Ganges, namely, in the Chika-chiki dialect, and then spread into Maithili as spoken to the north of the Ganges?"

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য থেকে পষ্ট জানা যায়—

১. মিথিলা এক সময় বাঙালা ও মগধ দখলে নিয়ে ছিল।' আমাদের প্রশ্ন–এটা কোন্ শতকে, কখন?

২. ১২০০খৃ. অব্দে–'তুর্কী অভিযানের আগে মিথিলায় জাঁকজমকওয়ালা সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল', এটাই বা কিভাবে জানা গেল, তার কোন রেফারেন্স লেখক দেননি।

৩. ১২ শতক থেকে ষোল শতক তক মিথিলায় সংস্কৃত-চর্চার কেন্দ্র ছিল'। একথা সাচ্চা হ'লে, জ্যোতিরীশ্বর-এর 'বর্ণরত্নাকর' সংস্কৃত ভাষায় লেখা নয় কেন?

৪. 'বাঙালা ও পূর্ব ভারতের অপরাপর এলাকা থেকে ছাত্ররা মিথিলায় লেখাপড়া শিখতে যেত'; এ-তথ্য ইতিহাস-সম্মত হ'লে, চৈতন্য দেব মিথিলায় বিদ্যাশিক্ষা ক'রতে যাননি কেন?

৫. সুনীতিকুমার, বিদ্যাপতির 'চোদ্দ শতকের শেষ দিকে জন্ম, আর পনের শতকের প্রথম দিকে মৃত্যু'—ব'লেছেন; তাহ'লে, গোপাল হালদার-এর কথা অনুসারে এ-সময়েই বিদ্যাপতি নতুন 'ব্রজবুলি' ভাষা পয়দা করেন এবং তাতেই বিদ্যাপতি-পদাবলী রচিত হয়। একথা কি ঠিক?

৬. এই বিদ্যাপতি ঠাকুর যদি মিথিলার 'গ্রেটেস্ট প্রতিভা' হন, তাহ'লে; বিদ্যাপতির যে-সব শ্রেষ্ঠ রচনা এ-কালের হাতে এসে পৌঁছেছে, সেগুলো তাঁর রচনা নয় কেন?

৭. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-যে-'বিদ্যাপতি-পদাবলী' প্রকাশ ক'রেছেন–তাকি সত্যি-ই 'ভারতীয় গীতি-কবিতার সুন্দরতম ফুল'? তা যদি হয়, তাহ'লে চণ্ডীদাস-এর স্থান কোথায়? তার কবিতা কি 'অসুন্দর'?

৮. বিদ্যাপতির প্রভাব নাকি 'বাঙালার গীতিকবিতার ওপর প্রবল'; তা যদি হয়, তাহ'লে, চণ্ডীদাসের পদাবলীর ওপর এবং 'কৃষ্ণকীর্তন'-এর ওপর বিদ্যাপতির কোন প্রভাব নেই কেন? বিদ্যাপতির রাধা, আর চণ্ডীদাসের রাধা কি এক?

৯. ষোল শতকে বিদ্যাপতির রচনাবলী যদি বাঙালায় ছড়িয়ে প'ড়ায় বাঙালীরা মুগ্ধ, অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও কবিতা-রচনায় উচ্চকিত হ'য়ে থাকে; তাহ'লে ব্রজবুলির জন্ম তো এসময়েই ধ'রতে হয়।-তা ধ'রলে চৈতন্য দেবের পূর্ববর্তী কালের পদাবলী আর পরবর্তী কালের পদাবলীর জন্ম হ'ল কি ক'রে?

কোন্ ভাষায়? চৈতন্যদেব এক জন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন ক'রতেন ব'লে জানা যায়। তিনি–অত বড় কবি বিদ্যাপতির পদ পছন্দ ক'রতেন না কেন? না তখন বিদ্যাপতির 'জন্ম'-ই হয়নি?

১০. ড. চট্টোপাধ্যায় বাঙালায় 'ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত' কিছু 'হিন্দী শব্দ' এবং বাঙালা আর মৈথিলীর মিশেল বিদ্যাপতির রচনায় নজর ক'রেছেন। তার ছাফ মানে, 'বাঙালা আর মৈথিলীর সাথে হিন্দী মিশে 'ব্রজবুলি' পয়দা।' এ-উক্তি লেখকের-ই।

১১. 'রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ-রচনায় ব্রজবুলি সারা বাঙালায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হ'ত।' একথা সত্য হ'লে, সারা বাঙালায় আকছার ব্যবহৃত ঐ সময়কার তথাকথিত 'হিন্দী'তে আলাদা কোন বই-কেতাব লেখা হয়নি কেন?

১২. 'মথুরার কাছে বৃন্দাবন - এলাকায় 'ব্রজ' নামক একটি জেলা আছে। 'ব্রজ ভাখা' সেখানকার-ই ভাষা।' একথা সত্য কি? সংস্কৃত শব্দ 'ভাষা' আর মৈথিল-শব্দ 'ভাখা' কি এক নয়?

১৩. 'কিন্তু এই 'ব্রজবুলি', পশ্চিমা হিন্দী, যাকে 'ব্রজভাখা' বলা হয়; তা থেকে পুরোপুরি আলাদা।' ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে-'এই 'কৃত্রিম ব্রজবুলি' বাঙালীর কাব্য-প্রতিভা রূপায়ণে অতিশয় সুন্দর প্রকাশ ঘ'টিয়েছে।' কৃত্রিম কিছু কি অতিশয় সুন্দর হয়?

১৪. 'ব্রজবুলি একটা কৃত্রিম কাব্য-ভাষা, আধুনিককাল অবধি (যেমন রবীন্দ্রনাথ) যা মাঝে মাঝে কবিতা রচনায় ব্যবহার করা হ'য়েছে।'

১৫. 'এটা পুরোপুরি একটা কৃত্রিম ভাষা।' 'একমাত্র কবিতাই ছিল এর সীমা-সরহদ্দ।' ইত্যাদি উক্তিও লক্ষণীয়।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এছাড়া আর যে-সব কথা ব'লেছেন—তা বর্তমান প্রসঙ্গে জরুরী নয় ব'লে আলোচনার বাইরে রাখা হ'ল।

যাহোক, উপরে ড. চট্টোপাধ্যায়ের যে-সব বক্তব্য পয়েন্ট-বাই-পয়েন্ট তুলে ধরা হ'য়েছে, তার মধ্যে কতিপয় অসংগতি, সচেতন পাঠকের নজর এড়াতে পারে না। পাঠক বুঝতে পারেন না যে, অতিশয় কৃত্রিম একটি কাব্য-ভাষা একজনের কলম থেকে সেকালের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সারা বাঙালায় ছড়িয়ে প'ড়ল কি ভাবে। এমনকি, ঐ ভাষায় কেবল গান নয় 'জীবনী কাব্য'ও লেখা হ'য়েছে; আর তা লেখা হ'য়েছে—তখনকার বাঙালার এই পূর্বাংশেও। মুলমান কবিরাও কি ভাবে ঐ কৃত্রিম ভাষা আয়ত্ত ক'রে ফেললেন, সেও এক ছওয়াল। আর বাঙালা, মৈথিলী ও হিন্দী (আসলে তখনকার উরদু—যা ঐ সময় 'হিন্দুস্তানী' নামে পরিচিত ছিল। হিন্দী নাম বহু পরবর্তী।) মিলিয়ে যদি 'ব্রজবুলি' তৈরী করা হ'য়ে যাকে,

তাহ'লে তার মাঝে আরবী-ফারছী শব্দের কোন স্থান ছিল না কি?

তা যে ছিল, তা পরবর্তী আলোচনায় জানা যাবে। তা হ'লে, ব্রজবুলির মধ্যে যে আরবী,ফারছী, উরদু (হিন্দী=হিন্দুস্তানী) মৈথিলী ও বাঙালার মিশেল ঘটে, তা বেশক বলা যায়। আপাততঃ তাই এটা মেনে নেয়া অযৌক্তিক নয় যে, ভাষাটা ছিল— ব্রিটিশ আমলে সুপরিচিত 'পুথির ভাষা'। পুথির মুছলিম কবিরা যাকে ছাফ ভাষায় 'বাঙালা' ব'লেছেন। আর আমরা বলি "মিশ্র ভাষা-রীতির কাব্য", "দো-ভাষী" কেতাব-পুথি ওগয়রহ! ওগয়রহ!! 'ব্রজবুলি'ও তেমনি ভুল নামে ডাকা ভাষা।

তাই ব্রজবুলি একটা সহজ স্বাভাবিক বাঙালা-ভাষা কি না; তা দেখা দরকার। আর দেখা দরকার মথুরার বৃন্দাবনে 'ব্রজ' নামক জেলা বা 'ব্রজভূমি' ছাড়া বাঙালাতেই কোন 'ব্রজভূমি' ছিল কি না। এবিষয়ে বৈষ্ণব কবিদের রচনায় কিছু মেলে কি না।

তার আগে ড. সুকুমার সেন 'ব্রজবুলি' সম্পর্কে কি সত্য আবিষ্কার ক'রেছেন—তা জানা আবশ্যক।

ড. সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্তে' লিখেছেন—"শুধু বৈষ্ণব পদাবলীতেই ব্যবহৃত, মধ্য-বাঙালার দ্বিতীয় কাব্যের ভাষা ব্রজবুলি। 'ব্রজবুলি' নামটি অর্বাচীন, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে চলিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণপদাবলীর যে ভাষা তাহা অবশ্যই ব্রজধামের "বোলি"।— ইহাই শব্দটির লোকনিরুক্তি। ব্রজবুলির অনুশীলন বাঙ্গালা দেশেই বেশি করিয়া হইয়াছিল, অন্ততপক্ষে চার শ' বছর—ষোড়শ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দ ধরিয়া। তবে বাঙালার দুই প্রতিবেশী প্রদেশে উড়িষ্যায় ও বিশেষ করিয়া আসামে—ইহা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দে অজ্ঞাত ছিল না। ব্রজবুলির কাঠামো সর্বত্রই এক। **বাঙ্গালা ব্রজবুলিকে ওড়িয়া-অসমিয়া ব্রজবুলি হইতে স্বতন্ত্র করা সম্ভব নয়।** সাধারণতঃ স্থানীয় শব্দ ও দুই-একটি নাম-বিভক্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। অসমিয়া ব্রজবুলিতে সর্বনামে কয়েকটি বিশিষ্ট পদ দেখা যায়। যেমন 'হামকু' (=আমার)।

ব্রজবুলির বীজ হইতেছে 'লৌকিক' অর্থাৎ অবহট্‌ঠ। পূর্বভারতের পূর্ব প্রান্তে নব্য ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব ও বিকাশের পরেও অনেককাল ধরিয়া 'লৌকিক' সাহিত্য লোকব্যবহারে চলিত ছিল। লৌকিক রচনা বাঙ্গালা-দেশে ব্যাপকভাবে না চলিলেও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দের সন্ধিকালে একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। যে

দুই-এক টুকরা নিদর্শন মিলে তাহা রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। যেমন গঙ্গাদাসের উদ্ধৃতি—

রাঈ দোহড়ী পঢ়ণ সুণি হসিউ কহ্নু গোআল।
বৃন্দাবন-ঘণ-কুঞ্জ-ঘর চলিউ কমণ রসাল॥

অথবা রাম তর্কবাগীশের উদাহরণ—

রাহীউ বালাউ জুআণু কহ্নূ।
কীলন্তু আলিঙ্গই কণ্হ গোবী॥

ব্রজবুলির বীজ অঙ্কুরোদ্ভিন্ন হইয়াছিল **সম্ভবতঃ মিথিলায়**। বাঙ্গালায় তাহা প্রতিরোপিত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ব্রজবুলির উৎপত্তি ও বিকাশ রাজসভায়—ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত—মিথিলায়, বাঙ্গালায়, আসামে, উড়িষায়, নেপালে। ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে ব্রজভাষার প্রভাবও অল্পস্বল্প পড়িয়াছিল। স্থানীয় ভাষার তো কথাই নাই।

তৎসম শব্দের প্রচুর ব্যবহার ব্রজবুলির একটি প্রধান বিশেষত্ব। ব্রজবুলির ছন্দ মাত্রামূলক। উচ্চারণে পদান্ত অ-কার লুপ্ত নয়। সুতরাং ব্রজবুলি কবিতায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার নির্বাধ। এই কারণে, এবং লৌকিকমূলতার জন্য অর্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগও অবারিত। বৈদেশিক—আরবী-ফারসী শব্দ ব্রজবুলিতে বেশি নাই। যাহা আছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইগুলি; আতর, ওয়াজ (আওয়াজ), কবজ, কম, কলম, কাগজ, কিতাপ, খত, গুলাব, চাকর, জীদ (=জিদ), দাগ, দালাল, দোকান, দোত, নফর, নালিশ, বাজার, বালিশ, মহল, মাফ, বদল, মুহর (এ দুইটি নামধাতুরূপেও ব্যবহৃত), সরম, সাহেব ইত্যাদি। এই বিদেশী শব্দগুলির বেশির ভাগ-ই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের রচনায় প্রথম দেখা যায়।”

ড. সেন, তাঁর এই বক্তব্যে ‘ব্রজবুলি’কে পষ্ট ভাবেই **রাজসভার ভাষা** ব’লেছেন। তাঁর মতে—

১. ব্রজবুলির উৎপত্তি ও বিকাশ রাজসভায় তের থেকে আঠারো শতকের মধ্যে। কিন্তু জোড়াসাঁকোবাসী বালক রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলি ভাষায় কবিতা রচনা করেন; সে-তথ্য ড. সুনীতিমুার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। আমরাও জানি। তাছাড়া, পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে—রাজসভার বাইরে ছিলেন, এমন বহুমুছলিম-অমুছলিম কবি ব্রজবুলিতে পদ রচনা ক’রেছেন। এ-সব গানের উপজীব্য কেবল রাধাকৃষ্ণের ‘পীরিতি’ ছিল না; জীবনী মূলক রচনাও এর

আওতাভুক্ত ছিল।

২. ব্রজবুলিকে ড. সেন 'দ্বিতীয় কাব্য-ভাষা' ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। সে-যুগে এটি 'দ্বিতীয় কাব্য ভাষা হ'লে, 'চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন'কে 'বাঙালা' কাব্য বলা হয় কেন? এ-ভাষা আর ব্রজবুলি এক, না আলাদা আলাদা বাঙালায় কি তাহ'লে, তখন হিন্দী, ফারছী, বাঙালা, মৈথিলী, সংস্কৃত ও ব্রজবুলি—এই পাঁচটি সাহিত্যের ভাষা চালু ছিল?

৩. 'তের থেকে আঠারো শতক; বিশেষ ক'রে (ড. সেনের মতে) ষোল-সতের শতকে এ-ভাষা উড়িষ্যা-আসামে এক-ই রূপ নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে প'ড়েছিল; তবে বাঙালাতেই এর অধিক অনুশীলন হয়'—এর কারণ কি? এর কারণ কি এই নয় যে, ঐ সময়ে তথা ছোলতানী আমলে ও মোগল আমলে, বাঙালা, মথিলা, উড়িষ্যা ও আসামে এক-ই সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক পরিবেশে মুছলিম রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায়, বাঙালা ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ ভাবে শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে এবং তা মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসামেও এক-ই রূপ-চেহারায় ছড়িয়ে পড়ে? এ জন্যেই তথাকথিত ব্রজবুলি বাঙালা ও তার চার পাশে বিস্তার লাভ করে ব'লে মনে করা সংগত। আমাদের ধারণা এবং ইতিহাসের ইসাদী এরকম-ই।

৪. 'বাঙালা ব্রজবুলি' নাম রাখার অর্থ কি? একি এক-ই ভাষার দুই নাম; না দুই ভাষার দুই নাম? একে এক-ই ভষার দুই নাম ব'লে গণ্য করা যায়। যেমন এক-ই হিন্দুস্তানী ভাষার দুই নাম—'হিন্দী'ও 'উরদু'। আবার এক-ই বাঙালা ভাষার দুই নাম 'বাঙালা ভাষা' ও 'বঙ্গভাষা', বা 'বাঙালা-ভাষা' ও 'গৌড়ীয় ভাষা'। 'ব্রজবুলি'ও যে তেমনি উনিশ শতকের হিন্দু লেখকদের দ্বারা পৃথকীকৃত বাঙালা-ভাষার-ই ভিন্ন নাম, তা পরের আলোচনা থেকে জানা যাবে।

৫. 'লৌকিক ভাষাই ব্রজবুলির বীজ'—ড. সেনের এমত সত্য হ'লে, এভাষার "উৎপত্তি ও বিকাশ, রাজসভায়" হয় কি ক'রে? আর এতে "সংস্কৃত শব্দের নির্বাধ (অবাধ) ব্যবহার", " তৎসম শব্দের প্রচুর ব্যবহার", "লৌকিকমূলতার জন্য অর্ধ-তৎসম শব্দের প্রয়োগও অবারিত",

৬. লেখকের অপর মত এ-ভাষায়—"বৈদেশিক আরবী--ফারসী" শব্দের ব্যবহার "বেশী নেই"। তবে কতটা আছে, তাও ড. সেন আলোচনা করেননি।

তার আগে, ড. সেন, তাঁর "বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) 'ব্রজবুলি'র বিষয়ে যা লিখেছেন, তা আলোচনা করা জরুরী। তিনি এ-বইয়ে লিখেছেন—"চতুর্দশ শতাব্দে উমাপতি-উপাধ্যায়ের লেখা সংস্কৃত নাটকের মধ্যে

যে গানগুলি আছে তাহার ভাষা এবং পঞ্চদশ শতাব্দে বিদ্যাপতির গানের ভাষা এক-ই। পঞ্চদশ শতাব্দে এই ভাষা ও গানের ঠাট সমগ্র পূর্বভারতে রাজপুষ্ট দেশীয় শিষ্ট সাহিত্যে গীতিকাবিতার আদর্শ যোগাইয়াছিল। ষোড়শ ও পরবর্তী শতাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ভাষায় ও ঠাটে বিস্তর পদাবলী লেখা হইয়াছিল। আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশে এই ভাষা "ব্রজবুলি" নাম পাইয়াছে। মনে হয় নামটির মূলে ছিল "ব্রজাওলি" (অর্থাৎ ব্রজ-সম্বন্ধীয়)। যেমন, সোনালি (অসমীয়া সোনারলি), রূপালি।

ব্রজবুলির মূলে আছে প্রধানতঃ দুইটি ভাষা। একটি অবহট্‌ঠ, অপরটি মৈথিলী। ব্রজবুলি গানের ছন্দ পূরাপুরি অবহট্‌ঠের, ভাষাতেও অবহট্‌ঠের ছাপ আছে। সে ছাপ পণ্ডিতেরা হিন্দীর বা ব্রজভাষার প্রভাবচিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধের আগে হিন্দীতে বা ব্রজভাষাতে এই জাতীয় কোন রচনা পাই না। মাধবেন্দ্রপুরী এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা মথুরা-বৃন্দাবনে যাইবার পরে, তবে সুরদাস প্রভৃতি প্রাচীন ব্রজভাষা-কবিদের কবিতাস্ফূর্তি হইয়াছিল। সুতরাং ব্রজবুলিতে হিন্দীর স্পর্শ যদি কিছু লাগিয়াও থাকে, তবে তাহা ষোড়শ শতাব্দের শেষপাদের আগে নয়। অথচ তাহার অনেক আগেই তীরহুতে, বাঙ্গালায় এবং আসামে যথেষ্ট পরিমাণে বৈষ্ণব কবিতা লেখা হইয়া গিয়াছে।

ব্রজবুলিতে মৈথিলীর ভাগ-ই বেশি। এ-মৈথিলী ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দের ভাষা। **বিদ্যাপতি এই ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন**, ক্রিয়াপদের রূপে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিতেছিল। সে-পরিবর্তনের পরিচয় পদাবলীর ভাষায় পাই না।

ব্রজবুলি গীতিকবিতার রীতি মিথিলা হইতে পূর্বভারতের সংস্কৃতিমান রাজসভাগুলিতে (—পঞ্চদশ শতাব্দে রাজসভাই সংস্কৃতির প্রধান বসতি ছিল—) ছড়াইয়া পড়ে—নেপালে, মোরঙ্গে, বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায়, আসামে। প্রত্যেক অঞ্চলে স্থানীয় ভাষার ছাপ কিছু না কিছু পড়িয়াছে।

এই সকল অঞ্চলের মধ্যে উড়িষ্যায় ব্রজবুলি-গীতিকবিতা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। অথচ তীরহুতের বাহিরে সবচেয়ে পুরানো রচনা বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে যে-গান, সেটা এখানেই রচিত হইয়াছিল। এই গানটি আছে 'পরশুরামবিজয়' নামক একাঙ্ক নাট্যরচনায়। রচয়িতা উড়িষ্যার রাজা গজপতি কপিলেন্দ্রদেব (রাজ্যকাল ১৪৩৫-'৬৬)। আসলে ইহা তাঁহার কোন সভাকবির রচনা। উমাপতির নাটকের মতোই, ভাষা সংস্কৃত। গান এই একটি মাত্র, "অমর রাগেণ গীয়তে"।

কেবণ মুনিকুমার পরশু দক্ষিণকর
বামেন শোহে ধনুশর না।
কোপেন বোলই বীরত তু সে মো ব বি লু তাত
আজ তোর ছেদিবই মাথ না।
শুণ রাজন হো কি এ তোর রাজ্যে ব্রহ্মবধে না ॥১॥

এ তোর চন্দ্রবদন মেঘে কি ঢাঙ্কিলা জহ্ন
তাহা দেখি বিকল মো মন না।
আবর দেখই অরষ্টি রাজ্যে তো রুধির বৃষ্টি
পুর বেড়ি রোদন্তি শৃগাল না।
শুণ রাজন হো কি এ তোর রাজ্যে ব্রহ্মবধে না ॥২॥

ভাষায় উড়িয়ার ছাপ এবং গঠনে ভণিতার অভাব লক্ষণীয়।

বাঙ্গালা দেশে লেখা **সবচেয়ে পুরানো ব্রজবুলি রচনা কবেকার তাহা বলা যায় না।** তবে রচনাকাল ধরিলে দুইটি গানের দাবী সর্বাগ্রে। একটি পূর্বে উল্লিখিত যশোরাজ-খানের গান। ইনি একটি কৃষ্ণচরিত কাব্য লিখিয়া ছিলেন। তাহার মধ্যে এই গানটি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে এক বৈষ্ণব কবি পীতাম্বর দাস 'রসমঞ্জরী' নামে বৈষ্ণব কবিতার আলঙ্কারিক রসবিচারের বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবি হোসেন শাহার নাম করিয়াছেন। সুতরাং ইহা তাঁহার রাজত্বকাল মধ্যে (১৪৯৩-১৫১৯) অবশ্যই লেখা। কৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার সময় হইয়াছে, রাধা ব্যস্ত হইয়াছে। দেখিবার জন্য ব্যস্ততা এতটাই যে, বেশভুষা সম্পূর্ণ কবিবারও সময় নাই। কালিদাস কুমারসম্ভবে ও রঘুবংশে বর দেখিবার জন্য পুরনারীদের ব্যগ্রতা এমনি ভাবেই বর্ণনা করিয়াছিলেন।

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত আরে সহজই গোর
হিম-ধরাধর কনকভূধর কোরে মিলল জোর।

কালিদাস নাথ– সম্পাদিত 'কীর্তনরত্নাবলীতে'ও গানটি আছে।

মাধব তুয়া দরশন কাজে
আধ পসাহন করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে। ধ্রু।
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম
নীল ধবল কমল যুগলে চান্দ পূজল কাম।
শ্রীযুত হুসন জগতভুষণ সোই ইহ রস-জান
পঞ্চ-গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশরাজ খান।

দ্বিতীয় গানটি নেপাল হইতে প্রাপ্ত এক বিদ্যাপতি-পদাবলী সংগ্রহে মিলিয়াছে। গানটি ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের সভাকবি, "রাজপণ্ডিত" জ্ঞানের রচনা। অতএব ধন্যমাণিক্যের রাজ্যকালমধ্যে (১৪৯০-১৫২২) লেখা। রাধার দূতী উদাসীন কৃষ্ণকে মানিনী রাধার কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিতেছে। মালব রাগে গেয়।

প্রথম তোহর প্রেম গৌরব
গৌরব বাঢ়লি গেলি
অধিক আদরে লোভে লুবুধলি
চুকলি তেরতি পেড়ি। ধ্রু।
খেমহ এক অপ-রাধমাব
পলটি হেরহ তাহি
তোহবিন জঞো অমৃত পিব এ
তৈক্রোণ জীবএ তাহি।
কালি পরসৃঈ মধমুর যে ছলি
আজ সে ভেলি তীতি
আনহু বোলব পুরুষ নির্দয়
(সহজে) তেজ পিরীতি।
বৈরিহু কে এক দোষ মরসিঅ
রাজ-পণ্ডিত জান
বারি-কমলা কমল-রসিয়া
ধন্যমাণিক জান।

'তোমার প্রথম প্রেমের গৌরবে (সে) গৌরব-গর্বিত হইয়া গেল। বেশি আদরে লোভ-লুব্ধ হইল। তাহাতে রতি খেলা চুকিয়া গেল। মাধব এক অপরাধ ক্ষমা কর, ফিরিয়া রাধাকে পেখিবে চল। তুমি ছাড়া, যদি অমৃতও পান করে তবুও রাধা বাঁচিবে না। কাল-পরশু পর্যন্ত যে মধুর ছিল, আজ সে তিত হইয়া গেল। অন্য লোকে বলিবে পুরুষটা নির্দয়, সহজে প্রেম উপেক্ষা করিল! শত্রুরও একটা দোষ ক্ষমা করিতে হয়। রাজপণ্ডিত জ্ঞান (বলিতেছে) বালিকা-কমলা-কমল-রসিক ধন্যমাণিক্য (ইহার মর্ম) জানেন।'

আসামে কোন ব্রজবুলি গান ষোড়শ শতাব্দের আগে লেখা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। শঙ্করদেব আসামের প্রথম ব্রজবুলি-গানের কবি। তিনি কয়েকটি ভালো নাট্যগীতি লিখিয়াছিলেন—এগুলি গীতিসর্বস্ব বলিলেও হয়। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিতেছি।"

উপরের লম্বা কোটেশন প'ড়ে প্রশ্ন জাগে, উমাপতি ধরের রচনায় নিহিত একটা গানের সাথে যদি বিদ্যাপতির গানের ভাষা মিলে যায়, তবে কি বিদ্যাপতির জন্মের শত বর্ষ আগে ব্রজবুলির জন্ম নয়? তাহ'লে বিদ্যাপতিকে ব্রজবুলির জনক বলা যায় না।

ড. সেন আরও ব'লেছেন—

১. 'ব্রজবুলি নামটা আধুনিক। এটা চৈতন্য সমকালীন নাম নয়।' সতের-আঠারো শতকে, মোগল আমলের সর্বাধিক ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি ওগয়রহের বিকাশকালে এভাষার নাম তাহ'লে কি ছিল: সে ছওয়াল সহজেই করা যায়। ভাষাটার নাম 'বাঙালা' (বাঙ্গালা) ছিল কি না? তাই বিবেচ্য।

২. 'ব্রজবুলির সাথে অবহট্‌ঠের কোন সম্পর্ক নেই।' এর কারণ কি এই নয় যে, আবহট্‌ঠ বা অপভ্রংশ স্তরের ভাষা ব্রজবুলির পূর্ববর্তী?

৩. 'ব্রজবুলি'তে 'হিন্দী'র 'স্পর্শ সামান্যই'—একথা কতটা সত্য, তা পরে আলোচনা করা হবে। ষোল শতকের শেষপাদেই যদি এই স্পর্শ লেগে থাকে, তাহ'লে চোদ্দ শতকের 'কৃষ্ণকীর্তনে' (বড় চণ্ডীদাস-রচিত) হিন্দীর প্রয়োগ দেখা যায় কেন?

৪. লেখক, তাঁর এ-গ্রন্থে ব'লেছেন—'ব্রজবুলিতে মৈথিলার ভাগ-ই বেশী।' আবার এক-ই অনুচ্ছেদে এরপর-ই লিখেছেন—'বিদ্যাপতি এভাষায় কাব্য-চর্চা ক'রলেও এর সাথে, তাঁর-সময়ের কথ্য ভাষার মিল ছিল না।' তাহ'লে ব্রজবুলির সাথে বাঙালা বুলির-ই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়; ড. সেন বোধ হয়, তা ভেবে দেখেননি।

৫. এ-গ্রন্থে লেখক আরও ব'লেছেন—

ক) 'উড়িষ্যায় ব্রজবুলি-গীতিকবিতা বিশেষ সুবিধে ক'রতে পারেনি।'

খ) 'আসামে ব্রজবুলিতে কোন গান ষোল শতকের আগে লেখা হ'য়েছিল ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায় না।'

গ) অন্যদিকে, 'বাঙালা দেশে লেখা সব চেয়ে পুরানো ব্রজবুলি কবে কার রচনা,—তা বলা যায় না'।

তা হ'লে 'ব্রজবুলির পয়দা বাঙালা দেশেই'—এ-দাবী কি অনিবার্য হ'য়ে ওঠে না ? তেমন অবস্থায় বিদ্যাপতির রচনাই ব্রজবুলির উৎস—বলা যায় কি ?

৩

এবার সমকালীন বাঙালার রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, ধর্মীয় ও সাহিত্য-

সংস্কৃতির আবহাওয়ার ওপর আলোকপাত করা জরুরী। ইতোপুর্বে 'ব্রজবুলি' সম্পর্কে যে তিন জন মশহুর ইতিহাসবিদের আলোচনা হাজির করা হ'য়েছে, তাঁরা মিথিলার রাজার বংশধারা ও অন্যান্য বিষয়ে যতটা আলোচনা ক'রেছেন; খোদ্ বাঙালার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আবহাওয়া, ছোলতানদের আনুক্রমিক সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার আলোচনা, তার শতাংশের একাংশও করেননি। এ-অভাব কিছুটা পূরণ ক'রেছেন—মরহুম ড. মুহম্মদ এনামূল হক। তিনি চৈতন্যদেবের জীবৎকালে বাঙালার ছোলতান হোছেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র ছোলতান নছরৎ শাহের রাজত্বকালীন সময়ে ব্রজবুলি ও অন্যান্য সাহিত্য-ধারার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"বাংলায় 'ব্রজবুলি-ভাষা'য় পদ রচনা করিবার রেওয়াজও হুসেন শাহের সময় প্রবর্তিত হয়। শ্রীখণ্ডের কবি যশোরাজ খান হুসেন শাহের কর্মচারী হইলেও, একটি ব্রজবুলি-পদে বাদশাহের যে-উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতে কবির প্রভুভক্তির চেয়েও বাদশাহের বাঙালা-সাহিত্য ও ভাষা-প্রীতির নিদর্শন অধিক মিলে। তিনি হুসৈন শাহকে শুধু জগৎ-ভূষণ বলিলে তাহা তাঁহার প্রভুভক্তির কথা বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক হইত, কিন্তু তিনি যখন বাদশাহকে বিদগ্ধ বা রসজ্ঞজন বলিয়া উল্লেখ করেন, তখন বাদশাহের বৈদগ্ধ্যের কথা ভুলিয়া যাওয়া যায় না।"

ড. এনামুল হক আরও লিখেছেন—"প্রাচীন হিন্দু-গ্রন্থের, বিশেষ করিয়া ধর্ম-সাহিত্যের বাংলা-ভাষায় অনুবাদ হুসৈন শাহের আর এক বড় কীর্তি। তাঁহার চট্টল ও ত্রিপুরবিজয়ী সেনাপতি পরাগল খাঁয়ের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত পাঁচালী' (ইহা পরাগলী মহাভারত নামেই প্রসিদ্ধ) রচনা করিতে গিয়া লিখিলেন—

কলিযুগ অবতার গুণের আধার।
পৃথিবী ভরিয়া যার যশের বিস্তার॥
সুলতান আলাউদ্দীন প্রভু গৌড়েশ্বর।
এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার॥

বাংলায় সর্ব প্রথম "বিদ্যাসুন্দর কাহিনী"-ও হুসৈন শাহের আমলে রচিত হয়। মৈমনসিংহবাসী কঙ্ক নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক জাতিচ্যুত হইয়াও এক পীরকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এই গুরুর আদেশেই সত্যপীরের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি আনুমানিক ১৫০২ খৃষ্টাব্দে "বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী" রচনা করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয় মূল্যই বর্তমান।

এভাবে হুসৈন শাহের রাজত্বকালে বাংলার লৌকিক-কাহিনী মনসা-মঙ্গল,

বাংলা-সাহিত্যের এক প্রধান শাখা 'ব্রজবুলি পদ', হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের অনুবাদ 'বাংলা মহাভারত' এবং ভারত-বিখ্যাত পৌরাণিক গল্প 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি বাংলা-সাহিত্যে স্থান পাইল।"

ছোলতান হোছেন শাহের অবদানের বিষয়ে আলোচনায় ড. হক একথাও জানিয়েছেন—"উদার দৃষ্টি ও সমুচ্চ আদর্শ সমন্বিত যে ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি; হুসৈন শাহ তাতে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি জন্মের দিক হইতে খাঁটি আরবী হইলেও, স্থানীয় এক বাঙালী পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহাতে তাঁহার বাঙ্‌লার মূল অধিবাসীর সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহার পরিণাম বাঙ্‌লার জন্য অতি সুফলদায়ক হইয়াছিল।" হোছেন শাহের সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রীতি, ধর্মীয় সহনশীলতা, মুছলিম-অমুছলিমে সমদর্শিতা এত বেশী ছিল যে, সমকালীন অমুছলিম একাধিক 'বাঙালী' কবি নিজ নিজ রচনায় তাঁর অসাধারণ তারিফ ক'রে গিয়েছেন। ড. হক , এর নজীর দিতে গিয়ে, বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামের কবি বিজয় গুপ্ত, চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার বাদুড্যা গ্রামের কবি বিপ্রদাস পিপলাই, ছিলেটের কবি যশোরাজ খান প্রমুখ কবির নাম-উল্লেখ ক'রেছেন। এসব কবির মধ্যে বিজয় গুপ্ত, তাঁর 'মনসা-মঙ্গলে', বিপ্রদাস পিপলাই, তাঁর 'মনসামঙ্গলে' (১৪৯৫); যশোরাজ খান, তাঁর একটা পদে (বৈষ্ণব পদ) ছোলতান হোছেন শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রেছেন। যশোরাজ খানের তারিফ ক'রতে গিয়ে ড. মুহম্মদ এনামূল হক যা লিখেছন— তা ইতেপূর্বে তুলে ধরা হ'য়েছে।

অথচ এত বড় গুণবান ছোলতান সম্পর্কে একালের হিন্দু পণ্ডিতরা কেবল নির্বাক-ই নন; তাঁর-ই সহনশীলতার জন্যে যে, চৈতন্যদেবের, বাঙালায় ধর্ম-প্রচার এবং রাস্তায় রাস্তায় কীর্তন ক'রে বেড়ানো সম্ভব হ'য়েছিল, সেকথাটা পর্যন্ত তাঁরা কবুল করেন না। এই প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনায় একমাত্র ব্যতিক্রম সুখময় মুখোপাধ্যায়। ড. মুহম্মদ এনামূল হক-এর মত তিনিও ছোলতান হোছেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র ছোলতান নছরৎ শাহ্ সম্পর্কে এন্‌তার তারিফ ক'রেছেন—তাঁর "স্বাধীন সুলতানী আমলের দু'শ বছর" গ্রন্থে। বলা দরকার যে, ছোলতান হোছেন শাহের পুত্র নছরৎ শাহ্‌ও পিতার মতই গুণবান ও শিল্প-সাহিত্য-কালচারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর বিষয়ে ড. মুহম্মদ এনামূল হক লিখেছেন—"সর্ববিষয়ে হুসৈন শাহের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ্ (১৫৩১) পিতার আরব্ধ কার্য হাতে লইয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের উৎসাহ দানেও তাঁহার কোন কার্পণ্য ছিল না। তিনিও মহাভারতের একখানা অনুবাদ করাইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। এই অনুবাদ অধুনা লুপ্ত হইলেও, তাহার সেনাপতি ও পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান শ্রীকরণ নন্দীর সাহায্যে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের যে অনুবাদ

করান, ইহার বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এখনও দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রীখণ্ডের 'কবিরঞ্জন' উপাধিক বিদ্যাপতি নছরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন। তিনি একটি ব্রজবুলি-পদে সশ্রদ্ধায় সুলতানের নাম এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

"বিদ্যাপতি ভাণি অশেষ অনুমানি
সুলতান নসির শাহ
মধুপ ভুলে কমলা বাণী"

কেবল বিদ্যাপতি (কবিরঞ্জন) নয়;—শেখ কবীর নামক এক মুসলমান কবিও একটি ব্রজবুলি-পদে এইভাবে সুলতান নসরৎ শাহের নাম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেন—

"সেখ কবির ভণে অহি গুণ পামরে জানে
সুলতান নসির সাহা
ভুলল কমল বনে।"

হুসৈন বংশের বাংলা-সাহিত্য-প্রীতি বংশানুক্রমিক। নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদীন ফীরূজ শাহ্ (১৫৩২-১৫৩৩) মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করিলেও শ্রীধর নামক এক কবিকে তিনি "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তখন ফীরূজ শাহ্ যুবরাজ। কবির নিজ উক্তি হইতেই ইহা জানিতে পারা যায়—

"নৃপতি নসির শাহ তনয় সুন্দর।
সর্বকলা নলিনী ভোগী ত মধুকর॥
শ্রী পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ॥"

ফীরূজ শাহের পিতৃবৎ গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮) মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে "চৈতন্য-ভাগবত" এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লোচনদাস চৌদ্দ বৎসর বয়সে "চৈতন্য-মঙ্গল" রচনা করেন। এই সময়ে বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা বংশীবদনও (জন্ম—১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) আবির্ভূত হন।

এই ভাবে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য শৈশব ও কৈশোর অবস্থা কাটাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শের শাহ্ ও তদ্বংশীয়দের দ্বারা প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া বাংলা শাসিত হয়; তাহাদের শাসন-কালে বাংলা-সাহিত্যের বিকাশ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটে—

১। মুক্তারাম সেন সারদা-মঙ্গল (রচনা—১৫৪৭ খ্রীঃ)
২। রামচন্দ্র খান অশ্বমেধ পর্ব (মহাভারত) (রচনা—১৫৫০ খ্রীঃ)

৩। জয়ানন্দ	চৈতন্য-মঙ্গল	(রচনা—১৫৭০ খ্রীঃ)
৪। রঘুনাথ পণ্ডিত	কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী	(রচনা—১৫৭০ খ্রীঃ)
৫। মাধবাচার্য	(ক) শ্রকৃষ্ণ-মঙ্গল	(রচনা—১৫৭০ খ্রীঃ)
	(খ) গঙ্গা-মঙ্গল	(রচনা—)
	(গ) চণ্ডীমঙ্গল	(রচনা—১৫৭৯ খ্রীঃ)
৬। বংশী দাস	মনসা-মঙ্গল	(রচনা—১৫৭৫খ্রীঃ)
৭। চন্দ্রাবতী	মনসা-মঙ্গল	(রচনা—১৫৮০খ্রীঃ)
৮। জ্ঞান দাস	(জন্ম-১৫৩০, মৃত্যু-১৫৮২) পদকর্তা।	
৯। গোবিন্দ দাস	(জন্ম-১৫৫৭,-মৃত্যু ১৬১২) পদকর্তা।'...	

বলা দরকার যে, পদাবলীর বাঙালী কবিদের মধ্যে তিন জন শ্রেষ্ঠ কবি এক-ই সময়ে বাঙালায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হ'লেন চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। এঁদের মধ্যে চণ্ডীদাসকে পনের শতকের এবং বিদ্যাপতিকে তাঁর সমকালীন ব'লে যদি ধ'রেও নেওয়া হয়; তাহলেও জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-বৃন্দাবন দাস প্রমুখের অস্তিত্ব না-কবুল করা যায় না। অথচ মুছলিম আমলের মহিমাকে না-কবুল করার খাহেসে বিশ শতকের কোন কোন হিন্দু লেখক তাঁদেরও মৈথিল কবি ব'লে তক্‌মা এঁটে দিয়েছেন। এটা বিস্ময়কর বৈকি!

যাহোক, আলোচ্য সময়ের দিকে খোলা মন নিয়ে, ছাফ নজরে তাকালে দেখা যায়, ষোল-সতের শতককে যে-বাঙালা ভাষার আত্মবিকাশের "স্বর্ণযুগ" বলা হয়, সেই স্বর্ণযুগের স্বর্ণমুষ্টির অনেক খানি-ই তো এই বৈষ্ণব পদাবলী। একে যদি 'বাঙালা' বা 'বাঙালা বুলি' না-বলা হয়; তাহ'লে এ-সময়কে বাঙালা-সাহিত্য, বাঙালা-ভাষা ও বাঙালা লিপির "স্বর্ণযুগ" বলা যায় না। ফলে, ব্রজবুলি যে, আসলেই বাঙালা বুলি, বাঙালীর বুলি; তা কবুল করা উচিত। 'ব্রজবুলি' যে, কেবল গানের বুলি নয়; তার অপর প্রমাণও আছে।

৪

এবার ভাষাগত দিক থেকে আলোচনার জন্য পহেলা প্রশ্ন তোলা জরুরী যে, 'ব্রজ' শব্দটি ভাষার নাম, না কোন বিশেষ এলাকার নাম। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মথুরা প্রদেশে "ব্রজ" নামে একটা "জেলা" আছে ব'লেছেন। সি. কলিন ডেভিস-(C. Collin Davies) লিখিত ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস-প্রকাশিত "An Historical Atlas of the Indian Peninsula" (2nd. Ed.) মানচিত্রের (১৯৮৯) ৪০তম অংশে আর্য-ভাষার যে-মোখ্‌তছর আলোচনা ও পর-পৃষ্ঠায় (P.83) যে বিভিন্ন ভাষার ম্যাপ দেওয়া হ'য়েছে, তাতে মথুরা অঞ্চলে

"ব্রজ" নামে একটি ভাষা এবং অবিভক্ত বাঙালায় "Bengali" নামে আর একটি ভাষার স্থান-নির্দেশ করা হ'য়েছে।* তার আগের পাতায় পষ্টভাবে পশ্চিমা হিন্দী তথা উর্দুর উল্লেখের পর লেখা হ'য়েছে—"Braj Bhasha (Muttra and the Central Gangetic Doab)"....... etc.তার ছাফ অর্থ মথুরা ও মধ্য গাঙ্গেয় দোয়াব এলাকায় 'ব্রজ ভাষা' প্রচলিত ছিল বা আছে। ভূমি বা স্থানের নামে ভাষার নাম হয় বিধায় ভৌগোলিক ভাবে চিহ্নিত এই এলাকাকেই 'ব্রজভূমি' বলা যায়। তাহলে, ডেভিস সাহেবের ম্যাপ অনুসারে উত্তর প্রদেশের মথুরার ভাষাই ব্রজভূমির 'ব্রজভাষা'। আর বাঙালা অপর একটা ভিন্ন ভাষা। মথুরার-ব্রজভূমি-ই 'বৃন্দাবন' নামে পরিচিত।

ঐ ম্যাপ অনুসারে-The most easterly of the Indo- Aryan language are Bihari, Oriya, Bengali, and Assamese. Bihari has three main dialects: Maithili , Magahi, and Bhajpuri " ....(P.82) তাহ'লে মৈথিলী যে বিহারীর-ই একটি শাখা; বাঙালার নয়; সেকথাই মেনে নিতে হয়। কিন্তু পুর্ববর্তী আলোচনায় দেখা যায়, বাঙ্‌লাদেশী ও ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকগণ একথা মেনে নিতে রাজি নন। তাঁরা মৈথিলীকে বিহারীর-ই আঞ্চলিক রূপ-বিশেষ বা হিন্দুস্তানী ব'লে গণ্য না ক'রে, মিথিলায় ব্রজবুলির জন্ম দেখাতে আগ্রহী। সেই সাথে তাঁরা এও ব'লতে চান যে, ঐ মৈথিলী ব্রজবুলি-ই বাঙালার ঘাড়ে চেপে ব'সেছে এবং মুছলিম আমলের বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য গ'ড়ে তুলেছে। মিথিলার বিদ্যাপতি ঠাকুর ছাড়া এ-সাহিত্যিক ভাষা পয়দা-ই হ'তে পারত না। এসব ভাষাতাত্ত্বিক, ব্রজবুলিকে—ব্রজভূমি বা মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষা ব'লে দাবী ক'রতে চাইলেও, তা করা কঠিন। কারণ বাঙালা থেকে মথুরা-বৃন্দাবনের দূরত্ব মানচিত্রে কোনাকুনি এক **হাজার** তিনশ' কিলোমিটার। আর সেকালের পায়ে হাঁটা ঘুর-পথে আড়াই হাজার কিলোমিটার অথবা তারও বেশী। এত দূরের কোন ভাষা, অন্য কোন ভাষাকে প্রভাবিত ক'রতে পারে কিনা—তা বিবেচ্য ।

এ-অবস্থায় গোটা বিষয়ের ফয়ছালার জন্য পহেলা মিথিলার পরিচয় নেয়া জরুরী।

মিথিলা

মিথিলা উত্তর বিহারে। এর পুরানো নাম বিদেহ। নামটা খুব-ই পুরানো। এক সময় নেপালের একাংশ এর আওতাভুক্ত ছিল। তখন উত্তর বিহারের রাজধানী

* মানচিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

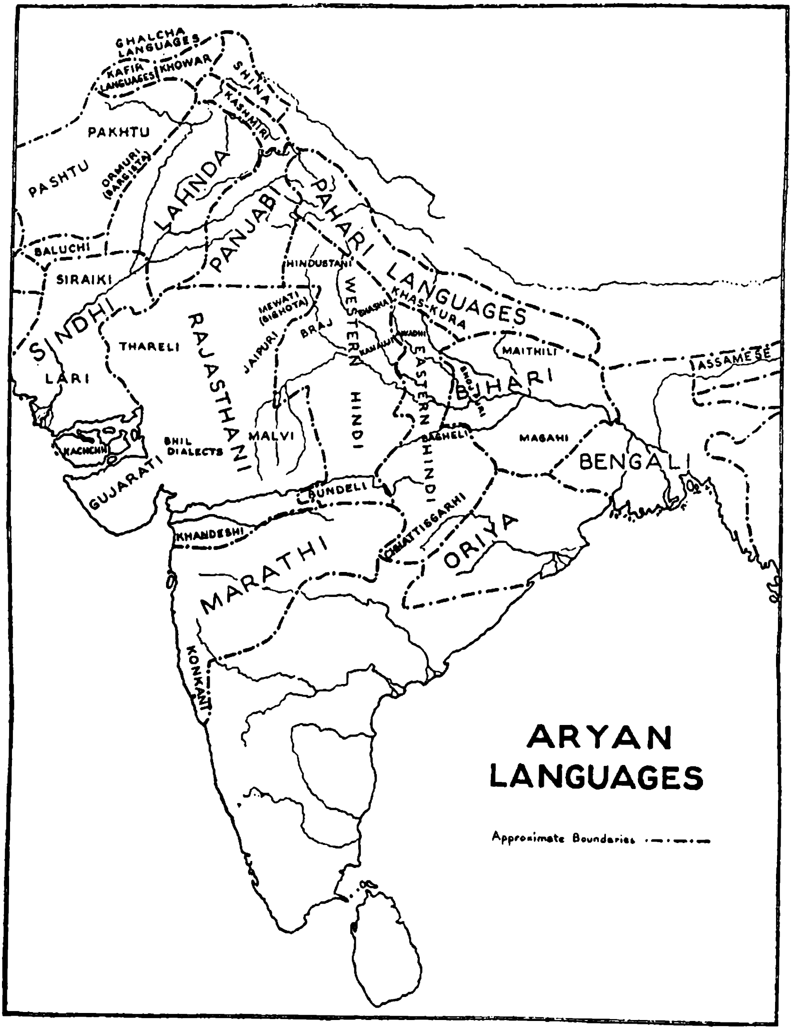
GHALCHA LANGUAGES
KAFIR LANGUAGES
KHOWAR
SHINA
KASHMIRI
PAKHTU
PASHTU
ORMURI (BARGISTA)
LAHNDA
PANJABI
PAHARI LANGUAGES
BALUCHI
SIRAIKI
SINDHI
HINDUSTANI
WESTERN HINDI
KHAS-KURA
MEWATI (BIGHOTA)
BRAJ
JAIPURI
THARELI
RAJASTHANI
LARI
MAITHILI
ASSAMESE
EASTERN HINDI
BIHARI
MAGAHI
BENGALI
BAGHELI
MALVI
BHIL DIALECTS
KACHCHHI
GUJARATI
BUNDELI
CHHATTISGARHI
ORIYA
KHANDESHI
MARATHI
KONKANI
ARYAN LANGUAGES
Approximate Boundaries

ছিল নেপালের জনকপুর। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'ইম্পেরিয়াল গেজেটীয়ার অব্ ইণ্ডিয়ায় (Provincial Series / Bengal/ vol- 1 ,Cal-1909) বলা হ'য়েছে—'মুজফ্‌ফর পুর (উত্তর), দ্বারভাঙা, চম্পারণ, পূর্ণিয়ার একাংশ, মুঙ্গের ও ভাগলপুরও একদা মিথিলার আওতাভুক্ত ছিল'। ঐ গেজেটীয়ার অনুযায়ী—"It passed successively under the Pal and Sen dynasties and was conquered by Muhammad Bakhatyar Khilji in 1203. From the middle of the fourteenth century it was under a line of Brahman kings until it was merged in the Mughal Empire in 1556." (P.126-'27) বলা দরকার যে, বখ্‌তিয়ার খিলজী ১২০০ খৃষ্টাব্দে গৌড় জয় করেন এবং তার আগের বছর যখন তিনি বিহার দখলে নেন: সে-সময়-ই মিথিলা তাঁর পদানত নয়। মিথিলা ছিল ত্রিহুতের অন্তর্ভুক্ত; আর ত্রিহুত ঐ সময় থেকে হয়—বাঙালার এলাকা। অবশ্য ১৩৫০খৃ. অব্দের আগ তক মিথিলা, ত্রিহুত, দ্বারভাঙ্গা ইত্যাদি এলাকা বাঙালা নামের আওতায় আসেনি। তাই বখ্‌তিয়ার খিলজীর "গৌড়" বিজয় আর মোগল বাহিনীর ত্রিহুত (মিথিলা) বিজয়-এর দরমিয়ানে যে-সময়: তা একটানা অক্ষত থাকেনি। এর মাঝে দু'বার এবং পরেও একাধিক বার এই এলাকা মুছলিম অভিযান-কবলিত হ'য়েছে। যদিও তার উল্লেখ ঐ গেজেটীয়ারে করা হয়নি; তথাপি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে জানা যায়—চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি (১৩৫১) বাঙালার ছোলতান হাজী মুহম্মদ শামছ্ উদ্দীন ইলিয়াছ শাহ্ বাঙ্গাল—মিথিলা, নেপাল, ত্রিহুত প্রভৃতি এলাকা জয় করেন। সে-সময় তিনি গণ্ডক নদীর ডান তীরে নেপালের উত্তরে হাজীপুর নামক একটা শহর স্থাপন করেন। এখানে তিনি একটা দুর্গ নির্মাণ করেন এবং একটা সরাইখানা ও মছজিদ তৈরী করেন।

এরপর পনের শতকের দ্বিতীয় দশকে এই এলাকায় আবার মুছলিম অভিযান পরিচালিত হয়। তখন বাঙালা রাজ্যের আওতাভূক্ত এই এলাকার শাসক ছিলেন রাজা শিবসিংহ। এ-সময় বাঙালার শাসন কুখ্যাত রাজা গণেশ ছিনিয়ে নিলে, শিবসিংহও তাঁর সাথে হাত মেলান। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ এবং মুছলিম-নির্যাতন জৌনপুরের ছোলতান ইব্‌রাহীম শর্কীকে, বাঙালা-বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ত্রিহুতের মাঝ দিয়ে বাঙালার রাজধানী গৌড়ে অভিযান পরিচালনার পদক্ষেপ নিলে শিবসিংহ তাঁকে বাধা দেন। ইব্‌রাহীম শর্কীর বাহিনীর সাথে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাজিত ও নিহত হন। কেউ কেউ বলেন—তিনি, ঐ যুদ্ধে বন্দী হন এবং তার পর আর তাঁর খোঁজ কেউ পায়নি। এটা ১৪১৫ থেকে ১৪২০ সালের মধ্যকার ঘটনা। ছোলতান ইব্‌রাহীম শর্কী ত্রিহুত বা মিথিলা জয় ক'রে বিনা বাধায়

বাঙালার রাজধানী গৌড় নগরী দখল করেন। রাজা গণেশ বেগতিক দেখে পালিয়ে যান। তাঁর পুত্র যদু ছোলতান ইব্‌রাহীম শর্কীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং ইছলাম কবুল করে মুছলমান হন। তাঁর নাম হয় জালালুদ্দীন। ছোলতান ইবরাহীম শর্কী জালালুদ্দীনের হাতেই বাঙালার শাসন-ভার অর্পণ করেন এবং এক-ই ধারায় মিথিলার শাসন-ভারও দেওয়া হয়—রাজা শিবসিংহের পিতা দেব সিংহকে। ড. আহ্‌মদ শরীফ লিখেছেন—"ইব্রাহীম শর্কী গণেশ-পুত্র কীর্তিসিংহকে মিথিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাদান করেন।" কিন্তু সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"১৯৪৮ সালের Bengal, Past and Present" পত্রিকায় সৈয়দ হাছান আসকারি একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধের একটি পাদটাকা (P.36, f.n.31) নীচে উদ্ধৃত ক'রছি—"Moulvi Muhammad Ilyas Rahman, a friend of the writer, has discovered a Bayaz of Mulla Taqyya, a courtier of Akbar and Jahangir, and copied in 1023 by Mulla Abul Hasan of Darbhanga, and in it we find references to `Raja Kans', a Hindu Zamindar, acquiring ascendancy in Bengal, oppressing the Muslims, and instigating Sheo Singh, the `rebellious son of Deva Singh, the Raja of Tirhut, to commit depredations upon the Muslims. Sheo Singh is said to have killed many holy Personages and contemplated a similar action against Makhdum Shah Sultan Hussain', the Khalifa of Makhdum Ala-ul Huq of Pandua. We are also told that Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur, being requested by Makhdum Nur Qutb Alam, marched against Bengal, but had to face the opposition of Sheo Singh in Tirhut. The latter was defeated, pursued and captured, and his stronghold, Lehra, was taken, His father, the dispossessed Raja of Tirhut, was restored to power on condition of allegiance and loyalty."

এই পাদটীকায় উল্লিখিত মুল্লা তকিয়ার ত্রিহুত সম্পর্কিত 'বয়াজ' পাটনার উরদু পত্রিকা 'মাছির'-এর মে- জুন ও জুলাই-আগষ্ট সংখ্যায় (১৯৪৯) প্রকাশিত হ'য়েছিল। তার থেকে শিবসিংহ-সংক্রান্ত অংশটি নিচেয় অনুবাদ ক'রে দেওয়া হ'ল—

"যখন হিন্দু জমিদার কান্‌স সমগ্র বাংলা প্রদেশের উপর আধিপত্য অর্জন ক'রলেন, তিনি মুছলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সঙ্কল্প ক'রলেন এবং তাঁর রাজ্য থেকে ইছলামের মূলোচ্ছেদ করাই হ'য়ে দাঁড়াল তাঁর লক্ষ্য। এই সময়ে ত্রিহুতের জমিদার শিও সিং (শিবসিংহ) তাঁর পিতা দেবসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে এবং রাজা কান্‌সের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে অবদ্ধ হ'য়ে নিজে ত্রিহুত প্রদেশের স্বাধীন রাজা হ'য়ে বসলেন। নিজের শক্তি বৃদ্ধি ক'রে তিনি রাজা কান্‌সের প্ররোচনায় তাঁর রাজ্যের মুছলমানদের উপরে লুটপাট চালাতে লাগলেন, দ্বারভাঙ্গার অধিকাংশ ধর্মপ্রচারক ও ইছলামের নায়কদের শহীদী পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করালেন এবং পবিত্রাত্মা মখদুম শাহ ছোলতান হোছেনকে আঘাতের পরিকল্পনা ক'রলেন। এখন, মখদুম শাহ পাণ্ডুয়ার আলা-উল্‌-হকের শিষ্য ছিলেন। আলা-উল হকের সুযোগ্য পুত্র হজরৎ কুৎব-উল্‌ আলমের অনুরোধে ছোলতান ইব্রাহিম শর্কী বাংলার দুর্বৃত্ত কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ও রাজা কান্‌ছকে দমন করার জন্য.... এক সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করেন। রাজকীয় সৈন্যবাহিনী যখন ত্রিহুতে পৌছল. শিও সিং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। যদিও ছোলতান বাঙালার দিকে যাচ্ছিলেন, তিনি যখন খবর পেলেন শিও সিং তাঁর তাঁবুর কাছাকাছি পৌছেছেন, ছোলতানের রোষানল দাউ দাউ শিখায় জ্ব'লে উঠল এবং তিনি খুব সাহস নিয়ে তাঁর দিকে মন দিলেন।

শেষে শিও সিং বুঝলেন প্রকাশ্য-সংগ্রামে ইব্‌রাহিমের বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; তিনি পালিয়ে অন্যদিকে গিয়ে অবশেষে সেখানকার সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ লেহরায় পৌছে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেন। কিছু সময় পরে, ঐ দুর্গের পতন ঘ'টল এবং তিনি বন্দী হ'লেন। সমগ্র ত্রিহুতরাজ্য আবার তার পিতাকে ফিরিয়ে দেয়া হ'ল ছোলতানের অনুগত ভৃত্য হিসাবে।"

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সভাসদ মুল্লা তকিয়া যা লিখেছেন, তার সমর্থক প্রমাণও অনেক আছে। প্রথমতঃ তিনি লিখেছেন যে, শিবসিংহ দেবসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে নিজে রাজা হ'য়েছিলেন। শিবসিংহ যে পিতার জীবিতাবস্থায় রাজত্ব ক'রেছিলেন, একথা বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' থেকে জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ মুল্লা তকিয়া লিখেছেন, বাঙালার রাজা কান্‌স বা গণেশের সঙ্গে শিবসিংহের বন্ধুত্ব ছিল। শিবসিংহ ও গণেশের আবির্ভাবকাল সমসাময়িক। তৃতীয়তঃ মিথিলায় পুরোনো প্রবাদ আছে যে, শিবসিংহ দিল্লীর. ছোলতানের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পরাজিত, বন্দী ও রাজ্যচ্যুত হন। ১৩০৭ সালের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (পৃ.২৯) বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এইভাবে প্রবাদটি লিপিবদ্ধ ক'রেছিলেন—

"শিবসিংহ এতদূর সাহসী হইয়াছিলেন যে, তিনি আপনাকে মুসলমানের

অধীনে বলিয়া মনে করিতেন না।... দিল্লীশ্বরের সৈন্যদল মিথিলা ঘেরোয়া করিল। দেবসিংহ পলায়ন করিলেন। শিবসিংহ একাকী শত্রুসেনায় প্রবেশ করিলেন। তাহার পর শিবসিংহ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন, সেখানে কারাগার তাহার স্থান হইল। দেবসিংহ বশ্যতা স্বীকার করিলেন, তাহার রাজ্য বজায় রহিল।

অপরের পদগুলি বাদ দিয়া একটি খাঁটি বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।"

দীনেশচন্দ্র সেন আরও লিখেছেন—"নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির পদের যে বিপুল সংগ্রহ করিতেছেন—তাহাতে মিথিলা ও বাঙ্গালা উভয় স্থান হইতে প্রায় ৮০০ পদ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সংগ্রহে রায় শেখর, কবি বল্লভ প্রভৃতি **বহু কবির পদ তিনি বিদ্যাপতির নামে চালাইয়াছেন।"**

আলোচ্য 'কোটেশন' উপস্থাপনের পর সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"মুল্লা তকিয়ার বয়াজের সঙ্গে উদ্ধৃত অংশের প্রায় পরিপূর্ণ ঐক্য আছে, কেবল জৌনপূরের জায়গায় দিল্লীর নাম ব'সেছে।".... ইত্যাদি।

যাহোক, উপরে লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য থেকে পষ্ট বোঝা যায়, ছোলতান ইব্‌রাহীম শর্কী গণেশের কোন পুত্রকে নয়; শিব সিংহের পিতাকেই ত্রিহুত রাজ্যের শাসকপদে পুনরায় বহাল করেন। কিন্তু ত্রিহুতকে তিনি জৌনপুর রাজ্যভুক্ত করেননি। বরাবরের মত সেটি ছিল বাঙালার-ই এলাকাভুক্ত এবং মুছলিম হুকুমতের অধীন। সে-সময় মিথিলার আদৌ কোন গুরুত্ব ছিল না। গুরুত্ব ছিল ত্রিহুতের।

এরপর ১৫৫৬, ১৫৭২ ও ১৫৭৪ সালেও ত্রিহুতে মুছলিম (মোগল) অভিযান পরিচালিত হয়।

আরও বলা দরকার যে, মোগল আমলে মিথিলা ছিল—বিহার সুবার এলাকাভুক্ত সরকার ত্রিহুতের অধীন (১৭৫৬)। অতএব নগণ্য একটি স্থান। তারপর বৃটিশ আমলে ১৮৭৫ সালে ত্রিহুতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। তার এক ভাগ নিয়ে গঠন করা হয়—"মুজফ্‌ফর পুর" জেলা। অন্য ভাগকে নিয়ে গঠিত হয়—"দ্বারভাঙ্গা" জেলা। ১৯০১-এ পাটনা বিভাগের অন্তর্গত ছিল মুজফ্‌ফর পুর ও দ্বারভাঙ্গা, জেলাদ্বয়। মিথিলা পড়ে এই দ্বারভাঙ্গা জেলাতেই। এ-সময় দ্বারাভাঙ্গার, তিনটি মহাকুমা ছিল—দ্বারভাঙ্গা, মধুবানী ও সমস্তিপুর। সমস্তিপুর দ্বারভাঙ্গার দক্ষিণ মহকুমা। গয়া ও ভাগলপুরও দ্বারভাঙ্গা জেলায় (১৯০১)। এ সময় হাজী ইলিয়াছ শাহের প্রতিষ্ঠিত হাজীপুর শহর পূর্বোক্ত মুজফ্‌ফরপুর জেলার একটা মহকুমা। এ-জেলাটি নেপালের উত্তরে। আর মিথিলা উত্তর বিহারে। "বিহার

শরীফ" এই নামটি বখ্‌তিয়ার খিলজীর-ই দেয়া।

যাহোক, উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, আজকের দিনে বাঙালা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ইতিহাস-পাঠকগণ "মিথিলা"কে যত জাঁকজমকপূর্ণ, বিখ্যাত ও মহা উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ব'লে জানেন; তা আদৌ ইতিহাস-সম্মত নয়। তার প্রায় পুরোটাই জাতীয়তাবাদী হিন্দু লেখক-লেখিকাদের কল্পনা-বিলাস। মিথিলা একটা পরগণার মর্যাদা কখনও ভোগ ক'রেছে কিনা—তাও বলা কঠিন।

কারণ মোল্লা তকিয়ার বয়াজে ছাফ ছাফ লেখা হ'য়েছে—"ত্রিহুতের জমিদার শিও সিং (শিব সিংহ)। তিনি গণেশের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হ'য়েই ত্রিহুত প্রদেশের স্বাধীন রাজা হ'য়ে ব'সেছিলেন।" কিন্তু সে-আর ক'দিনের রাজত্ব! তারপর দেবসিংহ-কীর্তিসিংহ যাঁরাই রাজত্ব করুন না কেন; তাঁরা যে বাঙালার-ই এলাকাভুক্ত ত্রিহুতের রাজা আখ্যায়িত 'জমিদার' ছিলেন, তা কবুল না ক'রে উপায় নেই। 'মিথিলা' নামটা তখন কেউ জানতই না।

আর সেকারণেই এ স্থানে-(মিথিলা)র কোন পুরানো ইতিহাস নেই। বিষয়টা আজকের দিনের বাঙালা- সাহিত্যের পাঠকানের নিকট অবাক করার মত হ'লেও, প্রকৃত সত্য এটাই। তার প্রমাণ পাওয়া যায়—যেখানে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের হাত পড়েনি; সেই গেজেটীয়ার ও সেন্সাস রিপোর্ট খুঁজলে। বাঙালা দেশ, বাঙালা-ভাষা ও বাঙালা-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় বিপুল ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ-মুক্ত, অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরাবেগ মন নিয়ে লেখা, বৃটিশ আমলের ইম্পিরিয়াল প্রভিন্সিয়াল গেজেটীয়ার এবং সেন্সাস রিপোর্টে খোলাখুলি ভাবে মিথিলা সম্পর্কে বলা হ'য়েছে— . . . "little is known of its early history prior to the Muhmmadan period. There can be little doubt that up to the twelfth or thirteenth century Derbhanga was relatively a backward tract "(পূর্বোক্ত গেজেটীয়ার, পৃষ্ঠা-১২৭)।

এক-ই গ্রন্থের ২৫৫ পৃষ্ঠায় পুনরায় বলা হ'য়েছে—"little is really known of the early history of Mithila." এখানকার ব্রাহ্মণদের গুরুত্ব ও ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত শিক্ষা-সংস্কৃতির বিশাল বিস্তৃতি এবং তাৎপর্যের যে-কথা উনিশ-বিশ শতকের ইংরেজী-বাঙালা রচনায় তুলে ধরা হয়েছে—তার কোন ভিত্তি নেই। বলা দরকার, উত্তর ভারতীয় পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের অন্যতম একটি ব্রাহ্মণ জন-কওমের নামেই "মিথিলা" নামকরণের সূচনা।

আর তাঁদের আদি পুরুষ দ্বারভাঙ্গার মহারাজ-পরিবার (whose

recognized head is the Maharaja of Darbhanga.)।

তা যদি হয়; তবে 'মিথিলা' নাম অনেক আধুনিক হ'য়ে পড়ে। কারণ দ্বারভাঙ্গার মহারাজ-স্টেটের সূত্রপাত হয়—সম্রাট আকবরের আমলে। এই পরিবারের আদি পুরুষ মহেশ ঠাকুর ছিলেন—ত্রিহুতের জমিদার গজরথপুর-বাসী শিবসিংহের কয়েক পুরুষ পরবর্তী কোন এক 'রাজা'র পুরোহিত। সম্ভবতঃ ১৫৭৪-'৭৫ সালে "Mahes Thakur induced Akbar to grant him what are now the Darbhanga Raj estates." (পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৩৮)। এই মহেশ ঠাকুর এসেছিলেন জব্বলপুর থেকে। ইনি ১৫৭২ ও ১৫৭৪ সালে ত্রিহুতে তথা বাঙালার আফগানদের বিদ্রোহ দমনের সময় দিল্লীর সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যই ঐ সম্পত্তি (দ্বারভাঙ্গা এস্টেট) পুরষ্কার পান, তা সত্য।

অতএব চোদ্দ-পনের এবং ষোল শতক অবধি মিথিলা একটা 'নামহীন' তুচ্ছ গ্রাম বই কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকিত কেন্দ্র হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।। কারণ, শিবসিংহ ও তার পূর্বাপর বংশধরগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন—"পরম শৈব"। শিবসিংহ যে-শিবের উপাসক বা শৈব ছিলেন, তা বিদ্যাপতির "পুরুষ-পরীক্ষা"য়ও বলা হ'য়েছে।

অতএব, কোন দিক থেকেই শিবসিংহ বা মিথিলার জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণ-গৌরবের কোন পরিচয় ছিল না ব'লে; সমকালে লিখিত মোল্লা তকিয়ার বয়াজে ত্রিহুত-বিজয়ের উল্লেখ আছে; মিথিলার নয়। শিবসিংহকে ত্রিহুতের একজন জমিদার বলা হ'য়েছে; "মিথিলার রাজা" (জমিদার) নয়। অতএব, আধুনিক কালে সাহিত্যের "মিথিলা" যে, আবেগময় কল্পনার রঙ্গিন সৃষ্টি—তা নিশ্চিত।

৫.

এবার বিদ্যাপতির পরিচয় আলোচনা করা যেতে পারে।

বিদ্যাপতি

একথা সত্য যে, 'মিথিলা'র মতই কবি বিদ্যাপতিকে নিয়েও ভাবাবেগ প্রকাশের অন্ত নেই। বিদ্যাপতি খুব বড় কবি ছিলেন, একথা সত্য ব'লে ধ'রে নিলেও, ছওয়াল ওঠে—পদাবলী-জগতে বিদ্যাপতি কি কেবল এক জন-ই? অনেকেই জানেন পদাবলী-জগতে "কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি" ব'লেও এক জন বিদ্যাপতি বিদ্যমান। শিবসিংহের অনুরাগী বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি কি অভিন্ন? এছাড়াও আছেন—'কবিবল্লভ' বিদ্যাপতি, 'মহারাজ-পণ্ডিত' বিদ্যাপতি ওগয়রহ। এজন্য এবার দেখা দরকার—বিদ্যাপতি ক'জন এবং তাঁদের পরিচয়-ই

বা কি?

নানা বিদ্যাপতির কথা

বিদ্যাপতির বহুত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রতে গিয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে খুব অল্প তথ্যই পাওয়া যায়। তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ এবং তাঁর সমসাময়িক পুথিগুলির পুষ্পিকা (যাতে তাঁর নাম উল্লেখিত আছে) পর্যালোচনা ক'রলে, তাঁর সম্বন্ধে মাত্র তিনটি তথ্য প্রামাণিক ভাবে জানা যায়—(১)তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ ক'রেছিলেন, (২) তিনি ছিলেন নানা শাস্ত্রে (বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রে) সুপণ্ডিত; (৩) জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ।" তাহ'লে, ব্রাহ্মণ-বিদ্যাপতির অস্তিত্ব কবুল না ক'রে উপায় নেই।

ক) ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ঐ বক্তব্য থেকে পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়—শিবসিংহের ভক্ত-বিদ্যাপতি স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ "সদুপাধ্যায়", "ঠক্কুর" (ঠাকুর) প্রভৃতি উপাধি থেকে এর প্রমাণ মেলে। স্মৃতিগ্রন্থ রচনায়ও সে-যুগে ব্রাহ্মণদের-ই অধিকার ছিল। এ-কথা মিঃ মুখোপাধ্যায়ের। এ-বিদ্যাপতির পিতা-মাতার নাম, বাসস্থানের নাম বা অন্য কোন নির্দিষ্ট পরিচয় জানা যায় না। সম্ভবতঃ এ-বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থ— "দানবাক্যাবলী" (স্মৃতি-গ্রন্থ). "বিভাগসার" (ঐ), "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী" (ঐ),"ব্যাড়ি ভক্তি-তরঙ্গিনী" (ঐ)ও রঘুনন্দনের "মলমাসতত্ত্বে" উল্লিখিত "বর্ষকৃত্য" ইত্যাদি। এসব বই সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃতে লেখা তাঁর আরও কয়েকটা বইয়ের নাম—"কীর্তিলতা", "কীর্তিপতাকা", "পুরুষ-পরীক্ষা" প্রভৃতি।

বলা দরকার যে, ড. আহ্‌মদ শরীফও এই বিদ্যাপতিকে "পণ্ডিত" এবং "স্মার্ত" ব'লেছেন। তার মানে তিনি ব্রাহ্মণ। আর ব্রাহ্মণরা সে-কালে সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, দেশীয় ভাষার চর্চা ক'রতেন না।—তা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব, তাঁর পক্ষে, 'ব্রজবুলি'র মত কোন অসংস্কৃত ভাষার চর্চা আদৌ সম্ভব নয়। স্বাভাবিক নয়।

খ) শাক্ত বিদ্যাপতি

সুখময় মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতিকে নিয়ে আলোচনাকালে ড. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বরাত দিয়ে লিখেছেন—"দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন যে, বিদ্যাপতি শাক্ত ছিলেন; তার প্রমাণঃ—(ক) বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' ও 'অদ্বৈত-নির্ণয়' লিখেছিলেন, (খ) 'পুরুষপরীক্ষা'র প্রারম্ভ শ্লোকে কবি আদি শক্তির (আদ্যাশক্তি বা কালী) বন্দনা ক'রেছেন—(গ) দ্বৈত-নির্ণয়ে তন্ত্রের কথা ব'লবার সময়ে তিনি তাঁর সম্প্রদায় ("ইত্যসম্মৎ সম্প্রদায়") এবং তাঁর পিতার পন্থার

(ইত্যস্মাকং পৈতৃকপন্থা) উল্লেখ ক'রেছেন, (ঘ) 'ভবিষ্য পুরাণে'ও তাঁকে শাক্ত বলা হ'য়েছে।" অতঃপর সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য—"এই সব যুক্তি খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রায় চূড়ান্ত ব'লে মনে হয়।" ভবিষ্যপুরাণে এই শাক্ত বিদ্যাপতির 'জন্মভূমি ও বাসভূমি উচিত গ্রাম' নামে একটি গ্রাম।"

গ) শৈব বিদ্যাপতি

অন্যদিকে, মিথিলার প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বিদ্যাপতি ছিলেন শৈব। সুখময় মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতির এই পরিচয়ও না-কবুল করেননি। তাঁর মতে—"এই প্রবাদ সত্য হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির শিব-বিষয়ক পদগুলিতে যে গভীর ও অকপট ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর তুলনা বিরল। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত কৃষ্ণবিষয়ক অনেক পদেও গভীর ভক্তির নিদর্শন পাই, কিন্তু ঐ পদগুলি মৈথিল বিদ্যাপতির লেখা নাও হ'তে পারে। **ঐ পদগুলি মিথিলায় পাওয়া যায় না**। মিথিলা ও নেপালে বিদ্যাপতির লেখা লৌকিক প্রেমের পদ প্রচুর পাওয়া গিয়েছে; অল্প কিছু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ মিলেছে, সে গুলিকেও লৌকিক প্রেমের পদ ব'ললে অত্যুক্তি হয় না। এগুলির মধ্যে ভক্তিব পরিবর্তে কাব্যরস-ই প্রধান হ'য়েছে। সুতরাং **বিদ্যাপতিকে শৈব বলার দিকেই যুক্তি বেশি।"**

এ-তরফে বলা দরকার যে, শিবসিংহ নাকি বিদ্যাপতিকে বিস্ফী গ্রাম দান করেন। তামার পাতে লেখা সে-দান পত্র যে জাল, তা প্রমাণিত হ'য়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"এই গ্রাম মিথিলা সীতামারি মহকুমার অধীন জারেল পরগণার মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত।" পূর্বে লিখিত গেজেটীয়ার-এ ঐ গ্রাম বেনিপতি থানার আওতায় ব'লে জানানো হ'য়েছে। যাহোক, বিস্ফী গ্রাম দানের ঘটনা সত্য হোক বা না-হোক বিদ্যাপতির পরিচয় সে-দিক থেকেও পষ্ট হ'চ্ছে। কারণ মিথিলায় চালু লোক-উক্তি অনুসারে বিদ্যাপতি পরিণত বয়সে বাজিৎপুর নামক গ্রামে পরলোক প্রাপ্ত হন। সে-গাঁয়ের নাম এখন—"বিদ্যাপতি নগর"।

ঘ) বৈষ্ণব বিদ্যাপতি

বলা দরকার যে, 'বৈষ্ণব' কবি বিদ্যাপতি-ই আমাদের আগ্রহের বিষয়। স্মার্ত, শাক্ত, শৈব কিংবা পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত বিদ্যাপতি নয়। কিন্তু বিদ্যাপতি যদি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকবি হন; তবে তাঁকে "বৈষ্ণব" বলার কোন সার্থকতা নেই। কারণ, চৈতন্য-পূর্বকালে বাঙালায় (সেই সাথে মিথিলা বা ত্রিহুতেও) রাধাকৃষ্ণের প্রেমে মাতোয়ালা কোন কবি ছিলেন না। থাকতে পারেন না। এই কারণে বড়ু চণ্ডীদাস-এর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একখানি বৈষ্ণব রসের কাব্য নয়;

বরং ধামালী জাতীয় রচনা ব'লে মন্তব্য করা হ'য়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস নিজেও 'বৈষ্ণব' ছিলেন না। ছিলেন—বাসুলী সেবক বা 'চণ্ডী-উপাসক'। এক-ই ভাবে বিদ্যাপতিও হয়তো শাক্তই ছিলেন। সে-কারণেই হয়তো তাঁর পক্ষে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করা সম্ভব হয়। কেননা, শাক্ত-মতবাদের সাথে বৈষ্ণব-প্রেমতত্ত্বের কিছুটা নৈকট্য আছে। মানবিক প্রেমের স্থূল রূপায়ণ তাই বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এক শ্রেণীর পদে নজর না ক'রে পারা যায় না। এধারার শুরু যেহেতু জয়দেব থেকে; সেজন্য বৈষ্ণব ধর্ম, বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত জন্মের পূর্ববর্তী আমলেই যে, এর প্রস্রবণ বাঙালাতেই সৃষ্টি হয়; তা জয়দেবের সাথে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের একত্র উল্লেখ থেকেও বোঝা যায়। যথা—

"জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥"

বাঙালা ও সংস্কৃত রচনায় এ-রকম বহু উল্লেখ থেকে একথা মেনে নিতে কষ্ট হয় না যে, চণ্ডীদাস-সমকালীন বিদ্যাপতি, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্ত না হ'য়েও 'বৈষ্ণব মহাজন'দের অন্যতম ব'লে গণ্য হন এবং জয়দেব-চণ্ডীদাসের মত তিনিও ছিলেন বাঙালার-ই কবি; মিথিলার নন। তাঁর সমকালীন পরিচয় শাক্ত—পরবর্তী পরিচয় 'বৈষ্ণব'।

ঙ) সহজিয়া কবি বিদ্যাপতি

এ-বিষয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"বাংলার সহজিয়াদের মতে শিব সিংহের রানী লছিমার সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রেম-সম্বন্ধ ছিল এবং লছিমাই ছিল তাঁর পরকীয়া নায়িকা। **মিথিলাতে এই প্রবাদ অজ্ঞাত**। এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক।" একথা সত্য হওয়াই স্বাভাবিক। তবে, সহজিয়াদের এই দাবী বিদ্যাপতির 'বৈষ্ণব'- পরিচয়ের পরিধি কেবল বাঙালাতেই সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়েছে—তা কবুল না-ক'রে উপায় নেই।

এরকম আরও বিদ্যাপতির উল্লেখে নানা বিশেষণযুক্ত বিদ্যাপতির খোঁজ পাওয়া যায়। ঠিক চণ্ডীদাসের মত অবস্থা। তবে এই অবস্থা এক দিনে তৈরী হয়নি। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিকে নিয়ে যে-ফ্যাকড়া, তা গত এক শ' বছরের তৈরী। তার চমক দেওয়া বিবরণও পাওয়া যায়। এ-তরফে দু'টি মাত্র বিষয়ের দিকে নজর আকর্ষণ করা চলে।

(১) বিদ্যাপতির মৈথিল-নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য তাম্রলিপি ও অন্যান্য জালিয়াতি

বিদ্যাপতি যে, 'বাঙালার বাঙালী নন; মিথিলার নাগরিক'; এই তথ্য নির্মাণের নিমিত্ত নানা রকম জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়। সেগুলোর মধ্যে তিনটি জালিয়াতির বয়ান দেয়া জরুরী।

ক) তাম্রলিপি-জালিয়াতি

এক্ষেত্রে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে কোলকাত্তাই পণ্ডিতদের একাংশ বিশ শতকে বিদ্যাপতির নামে একটি তামার পাতে লেখা ভূমিদান-আদেশ প্রচার করেন। সেটির জোরেই বিদ্যাপতিকে মিথিলার বিস্ফী গ্রামের অধিবাসী ব'লে অকাট্য এক 'পাথুরে প্রমাণ' হাজির করা হয়। কিন্তু এক শ্রেণীর পণ্ডিতের এই জালিয়াতী সবাই কবুল ক'রে নিতে পারেননি। কারণ কাণ্ডটা এতই আনাড়ীর মত ছিল যে,—তা ধোপে টেকেনি। এ-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন যা লিখেছেন, তা নিচেয় কোট্ করা হ'ল—

"বিদ্যাপতির বিস্ফী গ্রাম প্রাপ্তিজ্ঞাপক তাম্রলিপি ও মিথিলার রাজপঞ্জীর তারিখ সমন্বয় করিতে গেলে নানা রূপ গোলযোগে পড়িতে হয়। ভূমিদান পত্রের কাল ১৪০০ খৃ. (২৯৩ ল. সং)। রাজপঞ্জী হিসাবে শিবসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির সময় ১৪৪৬খৃ.। সুতরাং শিব সিংহকে রাজা হওয়ার ৪৬ বৎসর পূর্বে ভূমিদান করিতে হয়, অথচ ভূমিদানপত্রে তিনি "দিগ্বিজয়ী মহারাজাধিরাজ" বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। ভূমিদানকালে বিদ্যাপতির বয়স ২০ বৎসর মাত্র কল্পনা করিতে হয়,—তদূৰ্দ্ধ বয়স স্থির করিলে বিদ্যাপতির জীবনী ১২৩ বৎসরেরও অনেক বেশী হইয়া পড়ে। ২০ বৎসর বয়স্ক বালক, ভূমিদান-পত্রে 'মহাপণ্ডিত' এবং 'নব জয়দেব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যায়। এরূপ নব যুবককে বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া মহারাজ শিবসিংহ তাঁহাকে একখানি বড় গ্রাম দান করিবেন—ইহাও একটি অদ্ভুত অনুমান। ২০ বৎসর বয়সে (১৪০০ খৃ.) কবি বিদ্যাপতি 'মহাপণ্ডিত' উপাধি এবং বিস্ফী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, মানিয়া লইলেও ১২৭ বৎসর বয়ঃক্রমে (ভৈরব সিংহের রাজত্ব ১৫০৬-১৫২৭ খৃ.) তাঁহাকে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিতে হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও কবিকে অন্যূন ৯৬ বৎসর বয়সে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রণয়ন করিতে হয়। বিদ্যাপতির কবিতায় শেষোক্ত রাজার নাম দেখিলেই তাঁহার রাজত্বকালে বিদ্যাপতি লিখিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ নাই, যেহেতু রাজা হইবার বহু পূর্বে নরসিংহদেব যুবরাজ অবস্থায় কবির সহিত সৌহার্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারেন। এরূপ বৃদ্ধ বয়সে কাব্য লিখিবার সামর্থ্য ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়; বিস্ফী গ্রাম দানকালে কবির অন্যূন ২০ বৎসর বয়স এবং 'দূর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার সময়ে তাঁহার অন্যূন ৯৬ বৎসর বয়স—দুই কষ্টকল্পিত "অন্যূনের" সাহায্যেও এই জটিল প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রাপ্ত হওয়া

গেল না।

ভূমিদানপত্রের সঙ্গে রাজসভার পঞ্জীর ঐক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক লেখকগণ ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠায় এরূপ কয়েকটি বড় রকমের তালি দিয়াছেন।

এখন ভূমিদানপত্র ও রাজপঞ্জী ইহাদের কোনটি কিংবা উভয়-ই অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে বহুদিন হইল শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছিলেনঃ—

"এই সনন্দে যে কেবল লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ আছে এমন নহে, সনন্দের অন্ত ভাগে আরও ৩টি অব্দ লিখিত হইয়াছে, যথা—সন(হিজরি) ৮০০। সম্বৎ ১৪৪৫। শাকে ১৩২১। আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এরূপে ৩টি অব্দ কোনও সনন্দে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নির্ম্মল হিন্দুহৃদয় এতদূর সতর্ক ছিল না। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতত্ত্ববিদ্ পাঠকগণ বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। কারণ কোন সনন্দে একাধিক অব্দ লিখিত হয় নাই এবং সেই অব্দ যে কোন্ রাজার প্রচলিত তাহা প্রায় স্থিররূপে লেখা হয় নাই, কিন্তু এ-সনন্দে স্পষ্টাক্ষরে লক্ষ্মণাব্দ, হিজরি সন,. বিক্রমসম্বৎ, শালিবাহন শকাব্দ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এই প্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে।

অল্পদিন গত হইল, শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন সাহেব ভূমিদানপত্রখানি জাল প্রতিপন্ন করিয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, তাঁহার যুক্তি অকাট্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, এই ভূমিদান- পত্রে যে সন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আকবর এতদ্দেশে প্রচলন করেন। আইন আকবরী প্রভৃতি পুস্তকে তাহা নির্দিষ্ট আছে এবং এ-কথা সর্ববাদিসম্মত। ভূমিদানপত্রের তারিখ আকবরের অনেক পূর্ববর্ত্তী, অথচ তাহাতে সেই অব্দ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে এই তাম্রলিপির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ তাম্রলিপির অক্ষরঃ—উহা দেবনাগর, কিন্তু তৎসাময়িক বহুবিধ পুস্তক ও তাম্রশাসনে যে-অক্ষর ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা মৈথিলী (?)। সে-সময়ের লিপিমালার প্রতি অভিনিবেশ করিলে, তাম্রলিপি-ব্যবহৃত অক্ষর যে, সে সময়ের নহে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।" বলা দরকার যে, মুছলিম শাসনাধীন বাঙালার গৌরব অস্বীকার ক'রে, সেকালের অখ্যাত-অজ্ঞাত মিথিলার গৌরব প্রচার করার জন্যই যে, ঐ তামার পাত তৈরী করা হয়; তা এখন স্পষ্ট। কিন্তু কেবল একখানা তামার পাত নয়, ঐ রকম একাধিক পদ-রচনা ক'রেও তা বিদ্যাপতির নামে চালিয়ে দেয়া হ'য়েছে। একটা নমুনা

দেওয়া চলে।

খ) পদ-রচনায় জালিয়াতি ঃ বাঙালা পদ

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ১৪১ পৃষ্ঠায় পাদটীকা রূপে একটি পদ কোট্ ক'রেছেন। সেটা হ'ল—

"জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর
মৈথিলী দেশে করুঁ বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে
রহ তহি রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে,
বিদ্যাপতি ইহা ভাণ॥"

এ-পদটি জাল, তা বেশক বলা যায়। কারণ পূর্ব-আলোচনায় জানা গিয়েছে—চোদ্দ-পনের শতকে মিথিলার কোন খ্যাতি ছিল না। ঐ এলাকা তখন ছিল ত্রিহুতের মধ্যে। এই এলাকাকে বিদ্যাপতি "মৈথিলী দেশ" ব'লতে পারেন না। তাছাড়া, শিবসিংহ কোন কালেই " পঞ্চ গৌড়াধিপ" ছিলেন না। 'পঞ্চ গৌড়' ব'লতে দীনেশচন্দ্র সেন-এর মতে —"স্বারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা (?) ও উৎকল"-(উড়িষ্যা)কে বোঝায়। বিল (Beal) সাহেবের মতে পঞ্চগৌড়—'উত্তর, মধ্য, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত।' এছাড়া, 'পঞ্চ গৌড়' ব'লতে যদি 'উত্তর বঙ্গ', 'পশ্চিম বঙ্গ', 'মধ্য বঙ্গ', 'দক্ষিণ বঙ্গ' এবং 'ত্রিহুত'কেও ধরা হয়; তা হ'লেও, শিব সিংহের 'পঞ্চগৌড়পতি' হওয়ার কথা হাস্যকর-ই হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ সমস্ত ভারত তো দূরের কথা, বাঙালার সিকি অংশও তিনি কখন দখল করতে পারেন নি। বাঙালায় বিদ্রোহী গণেশের সময় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে তাঁর উত্থান; আর গণেশের পতনের পূর্বেই তাঁরও পতন। এ-অবস্থায় শিবসিংহের "পঞ্চগৌড়েশ্বর" আখ্যাদান, বিদ্যাপতির নামে জালিয়াতি বই কি!

গ) পদ-রচনায় জালিয়াতি ঃ অবহট্‌ঠ পদ

এরকম জালিয়াতির আর একটা নজীর পাওয়া যায়—বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত একটা অবহট্‌ঠ পদে । সে-বিষয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত একটি অবহট্‌ঠ পদে পাওয়া যায় যে, দেবসিংহ ২৯৩ ল. সং-এ পরলোক গমন করেন।....পদটি নিঃসন্দেহে জাল। তার প্রমাণ (১) পদটিতে বলা হয়েছে, শিবসিংহ ১৩২৪ শকাব্দে পিতা দেবসিংহের

মৃত্যুর পর সিংহাসনে ব'সেছিলেন। কিন্তু 'পুরুষ-পরীক্ষা'র শেষাংশ থেকে জানা যায় যে, শিব সিংহের রাজত্বকালেও দেবসিংহ জীবিত ছিলেন।.... (২) ১৩২৪ শকাব্দের চৈত্র মাসের কৃষ্ণা-ষষ্ঠী তিথিতে বৃহস্পতিবার এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ছিল না।....(৩) পদটিতে বলা হ'য়েছে—দেবসিংহ ১৩২৪ শক বা ১৪০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন ক'রেছিলেন। কিন্তু দেবসিংহ যে, অন্ততঃ ১৪১৫খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তা একটি নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে।"—এই সূত্র পূর্বে আলোচিত মোল্লা তকিয়ার বয়াজ। যাহোক, এমনি ভাবে জাল-জলিয়াতি আরও করা হ'য়েছে। সে-সবের হকিকৎ আর বাড়িয়ে কাজ নেই।

২. "নব জয়দেব"-বিদ্যাপতির পরিচয়

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হ'য়েছে—বৈষ্ণব সাহিত্যের নানা জায়গায়, নানা পদে 'জয়দেব-বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাসে'র একত্র উল্লেখ করা হ'য়েছে। সে-সব রচনায় বিশেষ কোন জাল-জালিয়াতি আছে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু উনিশ-বিশ শতকে কোলকাতায় সরকারীভাবে 'ব্রাহ্মণ্যবাদী শোভেনিজম্' তৈরীর খায়েসে যে-সব 'পাথুরে প্রমাণ' তৈরীর কারখানা খোলা হয়; আর বাঙালা, বিহার ও উড়িষ্যার নানা স্থান থেকে যে-সব পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাকল্পদ্রুমদের ডাকা হয়—তাঁরাই অন্য অনেক কিছুর সাথে বিদ্যাপতির নামে তাম্রলিপি, পদ-পদবী তৈরী করেন। আর সেই তাম্রলিপিতে 'কুড়ি বছর' বয়সী বিদ্যাপতিকে "নব জয়দেব" এবং "মহারাজপণ্ডিত" আখ্যা দেয়া হয়। এঁরা শিবসিংহের নামে বিদ্যাপতিকে গ্রামদানের ডকুমেন্ট তৈরী ক'রে তাতে যেমন শিবসিংহের পক্ষ থেকে কবিকে " নব জয়দেব" বানান; তেমনি অপর দিকে, বিদ্যাপতির পক্ষ থেকেও জাল আত্মজীবনীমূলক পদ তৈরী ক'রে—সাধারণ একজন বিদ্রোহী সামন্ত-পুত্রকে "মহারাজাধিরাজ" (অর্থ যে-মহারাজার অধীনে আরও একাধিক রাজা ও তাদের রাজ্য র'য়েছে) এবং 'পঞ্চগৌড়ের অধিপতি' বা "পঞ্চগৌড়াধিপ" ছাপে সীল মোহর তৈরী করেন। কিন্তু কোনটাই ধোপে টেকেনি।

এ অবস্থায়, বিদ্যাপতির নামে আরোপিত অতি দুর্লভ পুরানো পদাবলী ও বই-কেতাবের হদিছ কোথায় পাওয়া গেল, কি ভাবে পাওয়া গেল; তা আর একটা প্রশ্ন।

কারণ একথা সবাই জানেন—চৈতন্য-পূর্ব আমলের সাহিত্যকর্মের বিশেষ কোন নজীর পাওয়া যায় না। ইতোপূর্বে বলা হ'য়েছে—'বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত যে-সব কৃষ্ণবিষয়ক পদে গভীর ভক্তির নজীর আছে, সেগুলো

মিথিলায় পাওয়া যায়নি। অথচ বৈষ্ণব-রসে রসায়িত তথাকথিত মৈথিল কবির প্রায় হাজার খানেক পদ কবে, কিভাবে, কোথা থেকে খুঁজে পাওয়া গেল; সে ছওয়ালের জবাব পেতে দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তির প্রতি মনযোগ দেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—"সম্প্রতি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কতগুলি প্রশ্ন সমাধানের সময় হইয়াছে, আমরা এ-সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিতে পারি না।

কয়েক বৎসর পূর্বে একটা ধারণা হইয়াছিল, যে সংস্করণে কবির ভণিতাযুক্ত অথবা প্রবাদ বা অনুমান-মূলক কবির পদ বেশী থাকিবে, এক কথায় যে সংস্করণ যত বৃহদাকৃতি হইবে—ততই তাহা উৎকৃষ্ট হইবে।

কোন সম্পাদক বিদ্যাপতির পদসংখ্যা ২০। ৩০টি দিলেন, জগদ্বন্ধু ভদ্রের পর গ্রীয়ারসন এবং তৎপর সারদা মিত্র পদসংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন, তার পর অক্ষয় সরকার মহাশয় আরও কিছু উপকরণ বাড়াইয়া নৈবেদ্য সজ্জা করিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পরে নগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অতিকায় এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি এবার সত্যের ক্ষেত্র হইতে অনুমানের রাজ্যে পা দিয়া স্বীয় এলাকা অসম্ভব রূপ বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কথিত আছে বিদ্যাপতির এক উপাধি ছিল 'কবিশেখর', অপর এক উপাধি ছিল 'কবিবল্লভ',—তিনি কবিদের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং 'কবিভূষণ' প্রভৃতি উপাধিও তাঁহারই যোগ্য। কে কখন তাঁহাকে এই সকল উপাধি বা ইহাদের কোন একটি দিয়াছিলেন—তাহার ঠিকানা নাই। সম্পাদকগণ এই সমস্ত বিভিন্ন ভণিতার পদ দু'হাতে কুড়াইয়া তাঁহাদের সংস্করণ ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন—ভণিতাহীন বহু পদ তাঁহারা শুধু তাঁহাদের **বিমান বিহারী অনুমানের উপর জোর দিয়া** বিদ্যাপতির পদান্তর্বর্ত্তী করিয়া লইলেন। এই সকল পদের দুই একটি পদে যদি **ব্রজবুলির ছিটা-ফোঁটা** তাঁহারা পান তবে তো কথাই নাই—তাহা হইলে সোনায় সোহাগা মিলিয়া যায়,—**বিদ্যাপতির পদ বলিয়া চালাইতে তাঁহাদের আর দ্বিধা মাত্র থাকে না।**

যেন বঙ্গদেশে কবিল্লভ, নৃপবল্লভ, কবিশেখর প্রভৃতি উপাধি আর কাহারও ছিল না, যেন বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বাঙ্গালী কেহ কোন দিন যৈছে, তৈছে, যবহু, কবহু লিখেন নাই।

এই ভাবে বহু বাঙ্গালী কবির পদ গ্রাস করিয়া বর্ত্তমান বিদ্যাপতির সংস্করণগুলি বৃহদাকৃতি ধারণ করিয়াছে। অনেক কবির উৎকৃষ্ট পদগুলি বিদ্যাপতির কাব্যসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতি এত বড় কবি যে, তাহার এই ধার করা সৌন্দর্য্য পরিবার কোনই দরকার নাই, অথচ বঙ্গের অনেক কবি তাহাদের

শ্রেষ্ঠ পদের ন্যায়সঙ্গত দাবী সম্পাদকগণের খামখেয়ালীতে হারাইয়া ফেলিতেছেন।

দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু—নয়ন না তিরপিত ভেল"পদটি কখনও বিদ্যাপতির নহে, উহা বাঙ্গালী 'কবিবল্লভ' নামে কোন কবির। নগেনবাবু আমাকে জানাইয়াছিলেন, উহা মিথিলায় পাওয়া যায় নাই। তথাপি কি ভাবিয়া তিনি উহা তাঁহার পদসংগ্রহের শেষে স্থান দিয়াছেন, তিনি-ই জানেন। **বহু পদ খাস বাঙ্গালার বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত,** অথচ বিদ্যাপতির ভণিতায় চলিতেছে, যথা "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব।" বাঙ্গালার পল্লীর অলি-গলিতে শত শত গানে এই পদটির ভাব বিদ্যমান থাকিয়া উহা যে বাঙ্গালার নিজস্ব তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।"

এদু'টো কোটেশন থেকে ছাফ জানা যায়; বিদ্যাপতিকে মিথিলায় স্থানদান ক'রে মিথিলার যেমন একটা জাল ইমেজ তৈরীর চেষ্টা করা হ'য়েছে; তেমনি বিদ্যাপতির নামে আরোপিত বিপুল পদ-পদাবলী রচনা ক'রে—তাঁর নামে চালিয়ে, তাঁকে মহাকবি বানাবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। **বাঙ্গালার কবি বিদ্যাপতিকে, মিথিলার নামে ত্রিহুতের কবি বানাতে গিয়েই এত মিথ্যার বেসাতি।**

৬.

এবার দেখা যাক, 'ব্রজভূমি'র পরিচয় কি? সেখানেও কোন সংগতি-অসংগতি বা জাল-জালিয়াতি আছে কি না। আছে কিনা, নতুন কোন অর্থ ও তাৎপর্য।

'ব্রজভূমি'- ব্রজবুলি' সম্পর্ক

বলা দরকার যে, 'ব্রজবুলির' বিষয়ে আলোচনা ক'রতে গেলে 'ব্রজদেশ' বা ' ব্রজভূমি'র কথা আসবেই। কারণ এমন কোন 'ভাষা' বা 'বুলি' নেই; যার কোন আধার ছিল না কিংবা নেই। 'ব্রজবুলি' ব'লে কোন ভাষার কথা কবুল ক'রতে হ'লে, 'ব্রজভূমি'র কথাও তাই ভাবতে হবে।

বাঙালা-ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠকদের মাঝে যাঁরা 'মথুরা', 'বৃন্দাবন' কোথায়, সেই ভৌগোলিক জ্ঞান রাখেন না; তারা 'ব্রজবুলি'কে বৃন্দাবনের বুলি ব'লেই মনে করেন। তাঁদের যদি জানানো হয়, মথুবা প্রদেশে বা ভারতের উত্তর প্রদেশে বৃন্দাবন নামে একটি এলাকা আছে এবং বাঙালা দেশ থেকে তার দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার ; তখন তাঁরা থ মেরে যান। তার পরে যদি বলা হয়, সেই পুরানো আমলে, প্রায় ছ' শ' বছর আগে মথুরার ভাষা বাঙালায় এল

কি ক'রে, কারা আনল—তাহ'লে, তাঁরা ভাবনায় পড়েন। ঠিক কথা। ঐ সময় চৈতন্য দেবের জন্ম হয়নি; তাঁর বৈষ্ণব ধর্মও প্রচারিত হয়নি। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীও সৃষ্টি হয় নি। ফলে, ঐ সময় উত্তর প্রদেশ বা মথুরা-বৃন্দাবন থেকে যে হাজার হাজার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বাঙালায় চ'লে এসেছেন, তার কোন প্রমাণ নেই। সম্ভাবনাও নয়। তাহ'লে ঐ বুলি বাঙালায় এল কি ক'রে; আর বাঙালীরা শিখল কি ক'রে? 'ব্রজবুলি' ব'লে যে-ভাষার কথা বলা হয়; তাও কেবল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মাঝেই চালু ছিল না; অবৈষ্ণব এবং মুছলমানদের মধ্যেও চালু ছিল। চৈতন্য-পরবর্তীকালে অনেক মুছলিম কবিও 'ব্রজুবলি' ভাষায় বৈষ্ণব পদ লিখেছেন। তাঁরা এটা শিখলেন কিভাবে? ভাষাটা যদি মথুরার-ই হবে, তাহ'লে গোটা বাঙালা জুড়ে সে-আমলে—চোদ্দ থেকে আঠারো শতক তক, এ-ভাষা পুরুষানুক্রমে চালু থাকার ব্যাখ্যা কি?

আলোচ্য সমস্যার সমাধানে এবার খোদ্ বাঙালাতেই 'ব্রজভূমি' আছে কিনা বা ছিল কি না— তা দেখা যেতে পারে। কেননা, বাউল ধর্ম ও বাউলদের রচনা নিয়ে গবেষণাকালে জানা গিয়েছে—তাঁরা প্রতীকী-অর্থে 'মক্কা', 'বৃন্দাবন', 'রাধা-কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামবাচক শব্দ পরিভাষা রূপে গ্রহণ ক'রেছেন এবং শব্দগুলোর মূল অর্থ ও তাৎপর্যের বদলে ভিন্ন অর্থ ও তাৎপর্য আরোপ ক'রেছেন। যেমন—'মক্কা-'(শহর)কে,- লালন শাহ্ ফকীর—"আধ্ মক্কা" "(নারী), "গুপ্ত মক্কা" (নারী-জননাঙ্গ) প্রভৃতি ব'লেছেন। "বৃন্দাবন"কেও তিনি "গুপ্ত বৃন্দাবন" ও "ব্যক্ত বৃন্দাবন" রূপে রূপকায়িত ক'রেছেন। "কৃষ্ণ" সম্পর্কে তিনি ব'লেছেন—

"নন্দ যশোদার ছেলে
কবে এসে ক'রল লীলে
প্রাণ-কৃষ্ণের এহি লীলে
ভেবে দেখ তাই॥"

এরকম রূপকায়ন মুছলিম আমলের মুছলমান ও অমুছলমান সহজিয়া বাউল-বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন কবিদের লেখায়ও পাওয়া যায়। খোদ্ বৈষ্ণব গোস্বামীদের কলমেও এরকম রূপকায়ন ঘ'টেছে। তার প্রধান নজীর চৈতন্য দেবের "গৌরাঙ্গতত্ত্ব"। চৈতন্য দেবের নারী-সুলভ ছিমছাম পাতলা দেহ এবং অসাধারণ উজ্জ্বল রমণীয় কান্তির জন্য গোস্বামীরা তাঁকে এক-ই দেহে রাধা-কৃষ্ণ যুগল-রূপের অবতার ব'লে সাব্যস্ত ক'রেছেন। ভক্তির এই আতিশয্য যে, ভাষা ও ভূমির ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হ'য়েছে—এবার তার নজীর দেয়া হবে। বৈষ্ণব সাহিত্যে "অদ্বৈতমঙ্গল" নামে একখানি ছোট কাব্য আছে। রচনাটি ছোট। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এ-কাব্যের কবি—ঈশান নাগর। তিনি অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ও অনুচর ছিলেন। তাঁর জন্ম ও বাসস্থান ছিল ছিলেট। অদ্বৈতের জন্মও ছিলেটে। পরে তাঁরা দু'জনেই শান্তিপুর যান। শান্তিপুরে অদ্বৈতের মৃত্যু হ'লে, তাঁর পত্নীর আদেশে ঈশান ছিলেটে ফিরে আসেন এবং "অদ্বৈতপ্রকাশ" রচনা করেন। ঈশান, শান্তিপুরে যান—পাঁচ বছর বয়সে; আর ছিলেট ফিরে আসেন খুব বুড়ো বয়েসে। তাঁকে ঈশান দাসও বলা হয়। প্রায় ৭০ বছরেরও বেশী বয়সে তিনি "অদ্বৈতপ্রকাশ"—রচনা করেন।

অন্যতম বৈষ্ণব মহাজন কবি এই ঈশান দাস—"বৃন্দাবন" ও "ব্রজভূমি"র স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি "বৃন্দাবন"-এর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিতে লিখেছেন—

"স্বয়ং ভগবানে নাহি মায়ার সম্বন্ধ।
য়িহোঁ প্রেমরত্নাকর শ্রীসচ্চিদানন্দ॥
যাঁহা তান বাসস্থান তাঁহা বৃন্দাবন।
জীব নিস্তারিতে তনু করে প্রকটন॥
তাঁর মাতা পিতা আদি বান্ধব চিন্ময়।
ধামাদি চিন্ময় সবে সদানন্দময়॥"
—অদ্বৈত প্রকাশ /পৃষ্ঠা ৪২।

এ-কোটেশন থেকে পষ্ট বোঝা যায়, চৈতন্য দেবের সঙ্গে যা-কিছুর সম্পর্ক তার স্থূল অর্থের বদলে "চিন্ময়"অর্থ গ্রহণ করা বিধেয়। এই কারণে তখনকার বৈষ্ণবদের নিকট; মথুরার বৃন্দাবনের চেয়ে চৈতন্য দেবের বাসস্থান-রূপ বৃন্দাবন-ই ছিল অধিক গুরুত্ববহ।

ঈশান দাস "ব্রজধাম" বা "ব্রজভূমি"-র মহিমা প্রকাশ ক'রতেও এক-ই রকম চিন্ময়-চেতনার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি "অদ্বৈতপ্রকাশ"-এর ১৫তম অধ্যায়ে লিখেছেন—এক দিন আর্য্যরত্ন নামক এক ব্যক্তি এসে অদ্বৈত আচার্যকে জানান—

"শ্রীআচার্য্য রত্ন কহে শুনহ গোসাঞি।
সন্ন্যাস করিয়া হেথা আইলা নিমাঞি॥
শিহরিয়া প্রভু কহে কাঁহা তিঁহ রয়।
আচার্য্যরত্ন কহে গঙ্গা পারেতে উদয়॥---
শুনি মোর প্রভু দুঃখে হাহাকার করি।
শীঘ্র গঙ্গা-পারে উত্তরিলা লঞা তরি॥
প্রেমাবিষ্ট গৌর অদ্বৈতেরে দেখি ভণে।

কি আশ্চর্য্য আচার্য্য হে **আইলা বৃন্দাবনে॥**
শুনি প্রভু কহে **যাঁহা তোমার উদয়।**
তাহাঞি শ্রীব্রজধাম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
এত কহি শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দে লঞা।
শান্তিপুরে গেলা প্রভু গঙ্গা পার হঞা॥"
—ঐ, পৃষ্ঠা-৬২।

অতএব, 'ব্রজধাম' সেকালের বৈষ্ণবদের নিকট কেবল যমুনার তীরে ছিল না: গঙ্গার তীরেও ছিল। ছিল নদীয়া-শান্তিপুরে।

তাই 'অদ্বৈত মঙ্গলে'র ১৬শ অধ্যায়ে ঈশান দাস লিখেছেন—

শান্তিপুর হৈতে **ব্রজ** বহু দিনের পথে।
অচ্যুত আইলা গোরার আজ্ঞা-পুষ্প রথে॥---
গৌরাঙ্গে দেখি অচ্যুত কহে উচ্চ ভাষে।
আরে গোরা প্রাণ লঞা আইলি দূর দেশে॥
ভক্তি-ব্রজ ছাড়ি আইলি **গোপী-ব্রজ** ধামে।
ভক্তি-ব্রজে যাবি কি না ম'জবি গোপী-প্রেমে॥
যদ্যপি **শ্রীগোপী-ব্রজ** নিত্যানন্দ ময়।
তার উত্তমাঙ্গ সেই **ভক্তি-ব্রজ** হয়॥
তুয়া লাগি শ্রীযশোদা **আদি ব্রজ**-জন।
ভক্তি-ব্রজ নবদ্বীপে হৈলা প্রকটন॥
শূন্য গোপী-ব্রজে আইলি কিবা ভাবাবেশে।
তাথ জানিবারে মুঞি আইনু তোর পাশে॥"
—ঐ। পৃঃ ৬৯-৭০।

কবি এখানে, ছাফ কথায়; মথুরার "ব্রজধাম," "ব্রজ-জন" আর বাঙালার "ব্রজধাম", "ব্রজজন"-এর মধ্যে ফারাক বুঝিয়ে দিয়েছেন। মথুরার 'ব্রজধাম' কবির কথায় "শূন্য গোপী ব্রজ"। তা গুরুত্বহীন। অপর দিকে শান্তিপুর-ব্রজভূমি এবং শান্তিপুরের ব্রজজন-(এখানে বিশেষ ভাবে চৈতন্য দেবের মাতা ও পরিকরদের প্রতি ইশারা করা হ'য়েছে) ই শ্রেষ্ঠ। কারণ শান্তিপুর "ভক্তি-ব্রজ"। 'গোপী-ব্রজ' অপেক্ষা 'ভক্তি-ব্রজ' শ্রেষ্ঠ। কবির মতে 'নিত্যানন্দময় গোপীব্রজ' অপেক্ষা, 'ভক্তি ব্রজ নদীয়া-শান্তিপুর' উত্তম।

অতএব, সেকালে যে, চৈতন্য দেবের জন্মভূমি বাঙালার নদীয়া-শান্তিপুরই ছিল উত্তমোত্তম চিন্ময় 'ব্রজধাম' বা 'ব্রজভূমি'—তা কবুল না ক'রে উপায় নেই।

এবার দেখা যাক, এই নদীয়া-শান্তিপুরের তথা তখনকার গোটা বাঙালার সাহিত্যিক ভাষাই উনিশ শতকীয় হিন্দু শোভেনিস্টদের কথিত 'ব্রজবুলী' কিনা।

'ব্রজবুলি'র স্বরূপ

বলা দরকার যে, 'ব্রজভূমি' অর্থে ' ব্রজধাম' শব্দের ব্যবহার পুরানো হ'লেও, 'ব্রজবুলি' শব্দটি খবু-ই আধুনিক। কারো কারো লেখা থেকে জানা যায়, এ-শব্দটি পহেলা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যবহার করেন। সে-কথা সত্য হোক বা না হোক, কোন বৈষ্ণব পদে "ব্রজবুলি" নামে কোন ভাষার নাম পাওয়া যায় না। এ-বুলি যে, মিথিলার বুলি বা মৈথিলী ভাষা নয়—তাও পষ্ট। কারণ আজ যাকে মৈথিলী ভাষা ব'লে আলাদা নামের একটা ভাষাকে চিহ্ন দান করা হ'চ্ছে, বিদ্যাপতির সময়ে বা তার আগে-পরে সে-রকম কোন ভাষা-নাম চালু ছিল না। তাই বাঙালার 'ব্রজবুলি' আর মিথিলার "মৈথিলী বুলি" এক-ই রকম কৃত্রিম নাম। আসলে মিথিলা সহ গোটা ত্রিহুত তখন মুসলিম বাঙালার অধীনে থাকায় বাঙালা ও মিথিলার ভাষার মধ্যে তেমন ফারাক ছিল না। তাই 'মিথিলা'র কবি জ্যোতিরীশ্বর-এর 'বর্ণ-রত্নাকর' সম্পাদনা* ক'রতে গিয়ে ড. সুনীতিমুার চট্টোপাধ্যায় ও বাবু মিশ্র লিখেছেন—"The charactter is ancient Maithili which can be scarcely distinguished from Bengali as there are more than 50per cent of expressions that are Bengali". এটাই স্বাভাবিক। আরও বলা জরুরী যে, মৈথিলী ও বাঙালার মধ্যে এই পার্থক্য আরও কম হ'তে পারত; যদি মিথিলার ভাষা ও বাঙালার ভাষার দরমিয়ানে আর একটি ভাষার অস্তিত্ব না থাকত। সেটা হ'ল "মগহী" বা মাগধী (পূর্বোক্ত Atlas দেখুন। পৃষ্ঠা-৮৩। ভাষা-মানচিত্র)। কলিন ডেভিস-এর মানচিত্র অনুযায়ী মৈথিলী ও মগহী—বিহারী ভাষার এলাকাভুক্ত। বাঙালা, মগহীর গা ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা আলাদা ভাষা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হয়তো এই কারণেই প্রাচীন বাঙালা ভাষাকে মাগধী প্রাকৃতজাত ব'লেছেন।

এ-অবস্থায়, এ-কথা বলা চলে যে, উড়িষ্যা ও ত্রিহুত; বাঙালার-ই আওতাভুক্ত থাকায় মিথিলার ভাষা স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই বাঙালা ব'লে গণ্য ছিল। তেমন অবস্থা উড়িষ্যা এবং আসামেও ছিল। এজন্য ড. শহীদুল্লাহ্ উড়িয়া, আসামী ও বাঙালার আদি রূপ অভিন্ন ছিল ব'লে মত প্রকাশ ক'রেছেন। সেই 'অভিন্নতা' লিপিতেও ছিল। আসলে চোদ্দ-পনের শতকে মিথিলার বুলি ছিল প্রাকৃত বুলি-ই। বাঙালার মিশ্রণ, পনের-ষোল শতকে সেই বুলিকে উন্নত রূপ দিয়েছে। ক'রেছে গান ও কবিতার উপযোগী। বাঙালার অজ্ঞাত-পরিচয় অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ

* দেবনাগরী বা সংস্কৃত হরফে ছাপা এ -বইয়ের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ডান পাশে দেখুন।

॥ श्रीः ॥

॥ वर्णरत्नाकर ॥

॥ श्री ज्योतिरीश्वरठाकुर प्रणीत ॥

... ...

(पु)[१०क] नु कइसन देषु। नागल् · ताँगल · तापसि · तँत्नि · ताति · तिवर · तुरिआ · तुलुक · तुरुकटारुअ · धेओल · धाङ्गल · धाकल · धानुक · धोआर · धुनिआ · धलिकार · डँाव · डो|वटारुअ · खाँगि · षगार · हाडि · ढाढि · भल · चण्डार · चमार · गौँण्ठ · गोण्ठि · गोन्ति · गोआर · गावर · ओड · शुण्डि · साव · पञ्चकवार · पटनिञा · परिगह · | चावि · मुण्डवारि · वौन्द · कादव · नागर प्रभृति मन्दजातीय तँ वास · से कइसनाह जन ·। लङ्क · लगल् · लोभी · लवाल · लपटोर · नंढ · नड़जिह · नै|घुट · नहका · नषद्दय · लम्पाक एवम्विध दघलकार संयुक्ताह। अवर कइसन देषु॥ चोर · चञ्चल् · जुआर · छिनार · लगवार · नेओवसाइड · धल|×× ह · पेटकट · नाकट · कनकट · नाकटँ · मुण्डफोलुअ · नडितोलुअ · निषसन · निसत्त · निकारल · निकिसानए · करिहार · उधखलुअ · अनेक ये असदर्थ अनुचीती ता|[१०ख]कर आश्रय देषु कइसन। दूजर · वेल · वएर · वावुर · वरुण · वकाइनि · वङ्का · कातर · से पसार देले देखुह। खुसा · चुसा · फरुहौ · भुजा · वौचौ · वोवलि · करहल · क्रूर | कातोलि · मेथी · मगरैल · मनइचा ·

গীতিকবি' বিদ্যাপতি যা লিখেছিলেন: তা 'বাঙালার বুলি'-তেই লিখেছিলেন; মৈথিলীতে নয়। মিথিলায় পণ্ডিত বিদ্যাপতি থাকলেও থাকতে পারেন। তবে তিনি 'সংস্কৃতের সন্তান'। বাঙালার কেউ নন।

বাঙালার কীর্তন গানে যে-ভাষা উচ্চারিত হ'য়েছে, তা কোন কৃত্রিম 'সাহিত্যিক ভাষা'ও নয়। বরং ঐ ভাষা ছিল—সাধারণ মানুষের ভাষা; মুছলিম-অমুছলিম; সেকালের সকল জনকওমের সাহিত্যিক ভাষা। আর সেজন্যেই বৈষ্ণব পদাবলী এত সহজ, সরল, মিষ্টি, মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হ'তে পেরেছিল।

দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। পূর্বরাগ, উক্তি, প্রত্যুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণ মান, নির্হেতু মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য, দানলীলা, নৌকা বিলাস, বাসন্তী লীলা, বিরহ , পুনর্মিলন,—প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস; ইহাতে স্বার্থের আহূতি, অধিকারের বিলোপ; বাঞ্ছিতের দেহ–স্পর্শ করিতে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে; মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন,পদাবলী সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস।" প্রকৃতই পদাবলীর রাজ্য, প্রেমের রাজ্য—নয়নজলের রাজ্য। পদাবলীর কবিরা যে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় বাঙালার পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছেন এবং নিজ নিজ চোখের জ'লে ভেসে গিয়েছেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে, তাঁদের কাব্য-প্রতিভার কপোল বেয়ে, যে মুক্তার মত অনাবিল অমলিন শিশির-সিক্ত কথার অশ্রু; প্রেমের গান হ'য়ে, অন্তরের শিশির হ'য়ে ঝ'রে প'ড়েছে—তা কোন কৃত্রিম ভাষা, পরদেশী ভাষা বা মেকী ভাষায় সম্ভব ছিল না? প্রকৃতই তাই। অন্তরের কথা না হ'লে, অন্তরের ব্যথা ফোটে না। পদাবলীর বহু কবির শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে: তাঁরা সাধারণ জন-কওমের নিজের ভাষায় কীর্তন গান লিখেছিলেন এবং তাঁদের-ই মনকাড়া সুরে তা তাদের শোনারও ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের আমলে জনগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃত-বাঙালার কোন অস্তিত্ব ছিল না। মহা পণ্ডিত 'বাঙালী' চৈতন্যদেব বাঙালায় কিছু লেখেননি। তাঁর অনুসঙ্গী ও তাঁদের পরবর্তী পুরষ, গোস্বামী-মোহন্ত গণও বাঙালাকে ঘৃণা ক'রতেন। "চৈতন্য মঙ্গল", "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রভৃতি বৈষ্ণব জীবনী-গ্রন্থ গণমুখী বাঙালায় লেখা নয়। কবিরাজ গোস্বামীরা একে ব'লেছেন "ভাষা"। 'বাঙালা ভাষা' বা 'বঙ্গভাষা'ও নয়। কীর্তন-পদাবলী গোস্বামীরা পছন্দ ক'রতেন বা সেগুলো শুনতেন ব'লে মনে হয় না। কারণ ওসব পদ সংস্কৃতে লিখিত না হওয়ায়, সংস্কৃতনিষ্ঠ বৈষ্ণব গোস্বামীরা ইতর ভাষায় লেখা গান: ইতর

জনের সাথে এক পাটিতে, এক মাটিতে ব'সে শুনবেন; সেকথা কল্পনাও করা যায় না। তাই 'ব্রজবুলি'কে ভক্তি-ব্রজের 'বাঙালা বুলি' না ব'লে উপায় নেই। এ-বুলির সাথে বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন", বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত", 'ঈশান দাসের' "অদ্বৈত প্রকাশ" প্রভৃতির যতটা নিকট সম্পর্ক 'চৈতন্য-মঙ্গল', 'চৈতন্য চরিতামৃত', 'প্রেম-বিলাস', 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতির ততটা নয়। বৃন্দাবন দাসের স্বহস্ত লিখিত 'চৈতন্য ভাগবতে'র মূল পুথি এবং কবি ঈশান দাসের হাতের লেখা 'অদ্বৈত প্রকাশের' মূল পুথি পাওয়া গেলে, পদাবলীর ব্রজবুলি ভাষা আর ঐ দুই কেতাবের ভাষার আরও গভীর নৈকট্যের পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব হ'ত। মুছলিম পদকর্তাদের বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন রাধাকৃষ্ণ রূপকাশ্রিত রচনার ভাষা, আর 'অদ্বৈত প্রকাশ'-এর ভাষা খুব-ই কাছাকাছি। এই ভাষা সে-কালে সর্ব বাঙালায় গণভাষা রূপে গণ্য না হ'লে, ঈশান দাস ছিলেটে ব'সে সত্তর বছরেরও বেশি বয়সে ঐ ভাষায় "অদ্বৈত প্রকাশ" লিখতেন না। তা লোকপ্রিয়ও হ'ত না।

অতএব ব্রজবুলি যে, মথুরার ব্রজধামের, ব্রজজেলার বা ব্রজভূমির বুলি নয়; মিথিলার মৈথিলী বুলি নয়; বাঙালার তথা 'ভক্তি-ব্রজে'র-ই বুলি; তা বেশক বলা যায়।

৭.

এবার উপরের আলোচনার ভিত্তিতে কয়েকটি জরুরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার। তা হ'ল—

১. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কোট' ক'রে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন মিথিলার রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে যা ব'লেছেন—তা সত্য নয়। সে কথা স্পষ্ট।
২. মিথিলায় 'মৈথিল ভাষা' ব'লে কোন আলাদা ভাষা ছিল না; যা ছিল—তা বাঙালার-ই আঞ্চলিক ভাষার লৌকিক রূপমাত্র।
৩. বিদ্যাপতি ঠাকুর 'মৈথিল ভাষা'র "গ্রেটেস্ট রাইটার" নন। তিনি বাঙালা ভাষার-ই কবি।
৪. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত বিশাল 'বিদ্যাপতি পদসংগ্রহ'ও "ফেয়ারেস্ট ফ্লাওয়ার অব ইণ্ডিয়ান পোয়ট্রি" নয়; তা জাল-জালিয়াতি ভরা রচনা।
৫. বিদ্যাপতির ভাষা ও "বর্ণ-রত্নাকর"-এর ভাষা এক নয়। 'বর্ণ-রত্নাকর' উনিশ শতকে বানানো একটা জাল রচনা।
৬. তথাকথিত 'ব্রজবুলি' বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার বৃন্দাবন- এর (ব্রজভূমি) ভাষা নয়। ও-বুলি বাঙালার বুলি। বাঙালার-ই

ভাষা।

৭. ব্রজবুলি 'আর্টিফিসিয়াল ডায়ালেকট' নয়—তবে নামটা আর্টিফিসিয়াল' বটে।

৮. ভাগলপুরের (তখনকার 'অঙ্গে'র) 'ছেকাছিকি' ডায়ালেকটের সাথে চর্যাপদের ভাষার সম্পর্ক আছে; 'ব্রজবুলি'র নেই।

৯. সে-যুগে ঐ বুলি গণমুখী বাঙালা ভাষা ছিল। তাই মুছলমানরাও ঐ ভাষায় অকৃত্রিম ভাবে পদ রচনা ক'রতে সমর্থ হন।

এবার আলোচ্য পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত ব্রজবুলির সাথে বাঙালার বৃহত্তর মুছলিম জনগণের সম্পর্ক কেমন ছিল, এবার সে-বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

ব্রজবুলি ও ফারছী-বাঙালা

আগের আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে, বাঙালা-ভাষার যে-রূপ রামাই পণ্ডিতের লেখা "কলিমা জাল্লালে" ধরা প'ড়েছে; তাকে "আরবী-বাঙালা" বলাই উচিত। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ বাঙালার আর কোন নমুনা হাতে না আসায়; বাঙালীর মূল বাঙালা ভাষার নাম 'ফারছী-বাঙালা' ব'লে সিদ্ধান্ত নিতে হ'য়েছে। এই ফারছী-বাঙালা যে, মুছলমানের তৈরী মুছলিম জবান বা মুছলমানী বাঙালা—সে-কথা স্বতঃসিদ্ধ। এখন দেখা যাক এই মুছলমানী বাঙালার রূপ-চেহারা কি; আর তার সাথে ভক্তি-ব্রজের ঐ ব্রজবুলির কোন মিল আছে কি না।

ব্রজবুলির ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

'মুছলমানী বুলি'র পরিচয়-ই 'ব্রজবুলি'র পরিচয় কিনা তা পহেলা দেখা যেতে পারে। এ-তরফে ড. সুকুমার সেন, তাঁর "ইসলামি বাংলা সাহিত্যে" 'মুসলমানী বাঙালা'র যে-পরিচয় দিয়েছেন, তা হ'ল—" অপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য। যেমন—

তিন কেতাবের আলেম নহে সে জাহেল।
সাতশো সাগরেদ তার তামাম ফাজেল॥

এই পয়ারে বারোটি শব্দ আছে: ছ'টি বাংলা, ছ'টি আরবী-ফারসী।"

বলা দরকার, ড. সেন যে-কোটেশন হাজির ক'রে অপরিচিত আরবী-ফারছী শব্দের বাহুল্যের কথা ব'লেছেন—সে-সব শব্দের একটাও মুছলমানদের অপরিচিত নয়। অশিক্ষিত মুছলমান নর-নারীরাও ঐ দু'চরণের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বোঝে। ঐ সব শব্দ মোগল ও তার আগেকার আমলে অমুছলমানদের নিকটও সুপরিচিত ছিল। বৃটিশ আমলে ছিল না,—তাও বলা যায় না। এ-রকম আরবী-

ফারছী শব্দের বাহুল্য 'ব্রজবুলি'-পরিচয়ধারী বাঙালা বুলিতে নেই; তা বলা চলে না। তবে সব বৈষ্ণব পদ সম্পাদিত হ'য়ে একালের হাতে এসে পৌঁছেছে—সেগুলো থেকে আরবী-ফারছী শব্দ যে-ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হ'য়েছে; তা ঐ সব পদ-সংকলন ও জীবনী-গ্রন্থের সম্পাদনার ইতিকাহিনী জানলে, কবুল না ক'রে উপায় নেই।

এর পর ড. সেন 'ইসলামী বাংলা' বা ফারছী-বাঙালার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য রূপে, "হিন্দীর বাহুল্যে"র কথা ব'লেছেন। "যেমন,—মুঝে, তুঝে, মেরা, তেরা, এত্তা, যেত্তা (জেত্তা), এয়ছা, যেয়ছা, তেয়ছা, আবি,ভি, তক (=পর্য্যন্ত), দোন, পাচঙা (=পঞ্চম), ছটঙা (=ষষ্ঠ), সাতঙা (সপ্তম), চৌদা, মচ্ছব, বাত।"

এসব শব্দ, "হিন্দুস্তানী" বা উরদু ও হিন্দী শব্দ। উভয় ভাষায় সমভাবে চালু। ১৮ শতকের আগে যখন মুছলিম শাসনমালের 'হিন্দুস্তানী' ভাষা ভেঙে, দেব নাগরী লিপিতে উরদু লিখে, তার নাম 'হিন্দী" রাখার কথা, কেউ কল্পনাও করেনি; সে-সময় ঐ সব শব্দ বাঙালা (ফারছী-বাঙালা) ব'লেই চালু ছিল। 'পদাবলী'তে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে', 'অদ্বৈত প্রকাশে' এমন বহু শব্দ আছে। যথা—তুয়া, যৈছে, তৈছে, করিলুঁ, মুঞি, যাঁহা, কৈছে, কৈলা, বৈল, ইহঁ, জিয়াই, জিয়াইলা, মাঙ, পাঙ, তাঁহাঞি, দোঁহার, দোঁহে, তঁহি, তাঁহা, ডরাঞি, হঙ, যাঙ, তোহার, পাইলু, যাঁহা যাঁহা, তাঁহা তাঁহা, মাতোয়ারা (মাতোয়ালা), ইঁহার, ইঁহ, হঞা, কাঁহা, ঝাঁট, চৌবে, আসিলোঁ, তেঁঞি, আছোঁ, আঁছে , জীউ, রহু, উপজিল, মুচ্ছুদ্দি, মুনসি, মো, দোঁহারে, আখের, দরবার, দাঁড়ি, কাঁহে, কলমা, সভে, আজু, দুহুঁ, দোঁহাকারে, সমুঝিলা (সমঝাইলা), বাত, ইত্যাদি। এসব শব্দের মধ্যে যৈছে, তৈছে, কৈছে, ঐছে, কাঁহা, দোঁহা, দুহুঁ শব্দগুলো 'অদ্বৈত প্রকাশে' প্রচুর প্রয়োগ করা হ'য়েছে। এ-সব শব্দই যে বাঙালা ভাষার বা ফারছী-বাঙালার স্বাভাবিক উপাদান এবং ঐ সব শব্দ দেখিয়ে যে-কোন রচনাকে 'আলাদা বাঙালা' ব'লে ছাপ মারা যায় না; তা " অদ্বৈত-প্রকাশ" থেকে চয়ন করা উপরের শব্দ-সম্ভার থেকে পষ্ট বোঝা যায়।

ড. সুকুমার সেন ইছলামী বাঙালার আরও বিশেষত্ব দেখাতে হিন্দী তথা আরবী-ফারছী শব্দের 'ধাতু' ও 'নামধাতু'র ব্যবহার, বিবিধ বাঙালা ও আরবী, ফারছী (উরদু) শব্দের অনুসর্গ এবং উপসর্গ-ব্যবহারেরও উল্লেখ ক'রেছেন্। উল্লেখ ক'রেছেন—ফারছী বিভক্তি 'আন্' ব্যবহারেরও।

বলা দরকার যে, তিনি যেসব উপাদানের উল্লেখ ক'রে ইছলামী বাঙালা বা ফারছী-বাঙালাকে 'আসল বাঙালা নয়' ব'লে দেখাতে চেয়েছেন, তার অধিকাংশ উপাদান-ই ব্রজবুলি এবং সমকালীন বাঙালা ভাষায় পাওয়া যায়। তাই " ফারছী-বাঙালা' বা "ইসলামি বাংলা' যেমন প্রকৃত বাঙালা; তেমনি 'ব্রজবুলি'ও আলাদা

কোন বুলি নয়; তা বাঙালা বুলি-ই।

ফলে, শব্দতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বগত ব্যাকরণ বিচারে, ব্রজবুলি ফারছী-বাঙালার—দেহ-লগ্না; সংস্কৃত-বাঙালার বা মৈথিলীর নয়। এ-পরিস্থিতিতে "ব্রজবুলি"কে মথুরার বৃন্দাবনের ভাষা নয়; বরং "ভক্তি-ব্রজে"র ভাষা হিসেবে অবশ্যই বাঙালা দেশের 'বাঙালা বুলি' তথা নদীয়া-শান্তিপুরের গণমানুষের সাহিত্যিক বুলি ব'লে কবুল ক'রে নেয়া জরুরী। সমকালীন রাজনীতি, ধর্মনীতি, ভাষা-নীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণোচ্ছল পরিবেশে এই তথাকথিত 'ব্রজবুলি'র উদ্ভব ও বিকাশ—এক অতুলনীয় ঘটনা। একে যথার্থ ঐতিহাসিক পটভূমিতে মূল্যায়ন ও তা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

গ্রন্থপঞ্জী

১. অদ্বৈত প্রকাশ — ঈশান নাগর
কলি-১৯৩৯ ।

২. Census Report of Tirhut — (নামপত্র ছিন্ন)

৩. An Historical Atlas of the Indian Peninsula. Oxford, Second Ed. 1949. — C. Collin Devise

৪. Imperial Gazetteer of India (Provincial Series) Bengal, Vol. 1, Cal.- 1909.

৫. Varna- Ratnakara. Cal.- 1940. — Jyotirisvara- Kavisekharacarya

৬. The Origin And Development Of Bengali Language. Vol. 2. — Suniti Kumar Chatterjee

৭. মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য — মুহম্মদ এনামূল হক
ঢাকা- ১৯৬৫ ।

৮. বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড — মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
ঢাকা- ।

৯. বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড — দীনেশচন্দ্র সেন
কলি-১৯৯৩।

১০. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — দীনেশচন্দ্র সেন
৮ম সং. কলি-১৩৫৬।

১১. ইসলামি বাংলা সাহিত্য — সুকুমার সেন
বর্ধমান-১৩৫১।

১২. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন
প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, কলি-১৯৭০।

১৩. ভাষার ইতিবৃত্ত — সুকুমার সেন
বর্ধমান-১৩৪৫।

১৪. বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর — সুখময় মুখোপাধ্যায়
কলি-১৯৯৬।

১৫. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় — সুখময় মুখোপাধ্যায়
কলি- ১৯৮৭।